KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28 বেনিয়া রোড, কলকাতা-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication : জুন, ১৯৬৫ আশ্বিন, ১৯৬৫ কার্তিক, ১৯৬৫ অগ্রহায়ণ, ১৯৬৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

আপনার জামাকাপড় কাচবার জন্যে সেরা
—টাটার ৫০১ স্পেশাল সাবান

আপনার জামাকাপড়ের বিশেষ যত্ন নিতে হ'লে টাটার ৫০১ স্পেশাল সাবানে কাচুন! এই সাবান ব্যবহার করলে জামাকাপড় ধবধবে পরিষ্কার থাকে — খুব মিহি কাপড়েরও কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। জামাকাপড় কাচতে হ'লেই টাটার ৫০১ স্পেশাল সাবান ব্যবহার করবেন!

নতুন মুলদে ও লাল রঙের বোড়ক দেখে নেবেন।

টাটা অয়েল মিলস্ কোং লিঃ

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৬ষ্ঠ বর্ষ
অগ্রহায়ণ ॥ ১৩৬৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

ঐক্যের ধারা

কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষ – বর্ষাধারা চিরকাল তার প্রাণস্বরূপা। জীবিকার একান্ত অবলম্বন এই বর্ষা তাই বুঝি প্রভাবিত করেছে তার সঙ্গীত ও কলা, তার সাহিত্য ও লোকাচার, তার সামগ্রিক জীবনকে। রাজস্থানের প্রখর মরুবালুকা বা গ্রাম-বাংলার শ্যামল প্রান্তর—কোথাও বা মেঘরাগে আবার কোথাও বা 'আয় বৃষ্টি ঝেপে' গ্রাম্য ছড়ায় বর্ষার আবাহন হয়। প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক সুগভীর মানসিক ঐক্য এই আবাহনে সুস্পষ্ট। আবহমান কাল প্রবাহিত এই ঐক্যের ধারা সহজ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থায় আজ অধিকতর পরিপুষ্ট।

*

পূর্ব রেলওয়ে

* 'রাগমেঘ'—ষোড়শ শতাব্দীর রাজপুত চিত্রকলার অনুসরণে

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ॥ ১৩৬৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

। সূচীপত্র ।

প্রবন্ধ ॥ উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন পুঁথি। সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৮১
জগদীশচন্দ্রের কবিতা। মুরারি ঘোষ ৪৯৪
রূপকথা ও অবনীন্দ্রনাথ। অণিমা সেন ৪৯৯
উপন্যাস ॥ একছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০৩
অনুস্মৃতি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৫১১
সমাজসমস্যা ॥ সুব্রতেশ ঘোষ ৫১৬
সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ সাহিত্য ও চলচ্চিত্র ৫২০
সমালোচনা ॥ নিরঞ্জন হালদার। সোমেন বসু। বীরেন মিত্র ৫২২

সম্পাদক
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

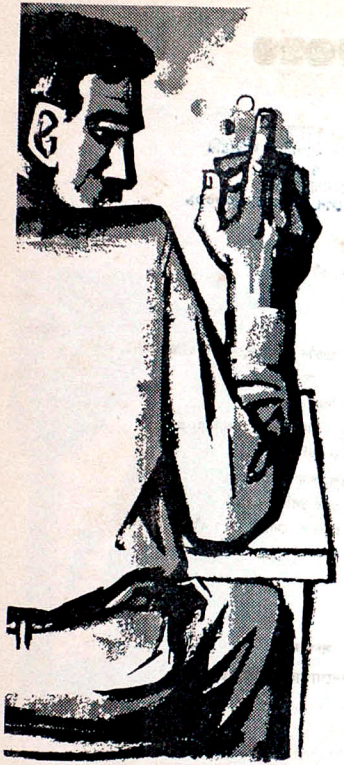

উনি ভিটামিনের রং দেখলেই চেনেন !

অবাক হয়ে যাচ্ছেন ? কিন্তু ভিটামিনের থেকে সত্যিই রং বেরোতে পারে। এবং এই অভিজ্ঞটি ফটো ইলেকট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে ভিটামিনের রং দেখেই তার ক্ষমতা বলে দিতে পারেন।

এত সঠিক তথ্য জানার দরকার কি ? কারণ, আমরা জানি যে আপনি হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষগুলি কেনার সময় সবসময় ভাল জিনিষই আশা করেন।

কাঁচা মাল কেনা থেকে তৈরী জিনিষপত্র পর্যন্ত অভিজ্ঞ, কুশলী এবং বৈজ্ঞানিকেরা বারে বারে পরীক্ষা চালান। এইভাবে পরীক্ষা চালানো হয় বলেই অমূল্য জাতীয় সম্পদ বাঁচে—উৎপাদনের সময়ও বাঁচে।

এইসব কারণেই আমরা আপনাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করেছে এমন ভাল জিনিষপত্র স্বল্পমূল্যে দিতে পারি।

দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 17-X52 BO

উত্তর বঙ্গের একটি প্রাচীন পুঁথি

সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

পুঁথিখানা ১২৩০ সালে নকল করা হইয়াছে। পুঁথিতে "ছিন্তিন মুণ্ড" "দন্তি" "যায়ন্তি" "গায়েন্তি" "তুষেন্তি" প্রভৃতি ক্রিয়া পদের প্রয়োগে পুঁথির প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পুঁথি চৈতন্য পরবর্তীযুগে রচিত ("কলি তরাইতে প্রভু হইলা চৈতন্য।)" দেব ভাষায় লিখিত বেদ, পুরাণ প্রভৃতি জাতীয়সম্পদ সাধারণের বোধগম্য নয় বলিয়া কোচবিহারের মহারাজা "নরনারায়ণ (১৫৪০—১৫৮১) এই সব গ্রন্থের সারমর্ম জনসাধারণের বোধগম্য স্থানীয় ভাষায় প্রচারের জন্য পণ্ডিতবর্গকে অনুরোধ করেন। এই পুঁথিও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি অবলম্বনেই লিখিত। এজন্য মনে হয় পুঁথিখানা মহারাজ নরনারায়ণের সময়েই রচিত হইয়াছিল।

পুঁথিতে—"হেনও অদ্ভুত কথা শুন একমনে।
দশরথ জন্মকথা গর্গমুনি ভনে।"

প্রভৃতি ভণিতা দৃষ্টে কবির নাম "গর্গমুনি" পাওয়া যায়। কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইন্দ্ররাজসূয় যজ্ঞের কবি—পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া নিজ কল্পনায় অদ্ভুত কাহিনী রচনা করিয়াছেন। এই উপাখ্যান জনসাধারণ যাহাতে পুরাণের মর্যাদা দান করে সেজন্যই মনে হয়, পুরাণকারদের অনুকরণে কবি নিজ নাম, পরিচয় প্রভৃতি গোপন করিয়া "গর্গমুনি" ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণের মত এই পুরাণের বক্তা শুক শ্রোতা পরীক্ষিত।

পুঁথির মধ্যে একাধিক স্থানে "বৈকুণ্ঠনাথ" নাম পাওয়া যায়, মনে হয় এই বৈকুণ্ঠনাথই পুঁথির লেখক। পুঁথির ভাষা দেখিয়া মনে হয় কবি উত্তরবঙ্গের অধিবাসী (তুমার পিতাক মারিঞা গদাধরে।' "অকুমারী ভয়ে মুনি আদ্রমন হইল"। "অসুরের হাতে মাও কর প্রতিগার।" অনেক অস্তুতি কৈল ভাই দুইজনে।) পুঁথি সম্পূর্ণ। পুঁথির প্রথমে—

অসুর নাশনি বন্দো বন্দো সে অভয়া।
চৌসটী যোগিণী বন্দো বন্দো নয়ানা গিরি।
দেবী মহেশ্বরী বন্দো কুলের গন্ধেশ্বরী॥

ইত্যাদি দেব স্তুতি করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। স্তব স্তুতিতে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করিলেন—

বর পাঞা মুনির পুত্র আনন্দিত হৈল।
ইন্দ্র পুরাণ কবি রচিতে বসিল॥
মাথা এ বন্দিয়া সরস্বতীর চরণ।
ইন্দ্র রাজসূই কহে ব্যাসের নন্দন॥

ভগবান্ বৈকুণ্ঠত্যাগ করিয়া রামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবতারাও তাঁহার সাহায্যের জন্য বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাম রাবণ বধ করিয়া সকলকে লইয়া অযোধ্যায় আসিয়াছেন—

বানররূপে বসে দেব শ্রীরামের সনে। পাছে সর্গ আরোহন কইল গদাধর।
সুখে বসন্তি রাম নইঞা বন্ধু জনে॥ সকল দেবতা গেলেন তার দোসর॥

সকলে নরবানররূপে স্বশরীরে স্বর্গে আসিয়াছেন, আনন্দে দেবতারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। নরবানরের আলিঙ্গনে দেবতাদের শরীরে দুর্গন্ধ হইল। তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মার নিকট যাইয়া বলিলেন— আমা সভার শরীরে গন্ধ করে কী কারনে।
তখন ব্রহ্মা—হাসিঞা বোলেন তুমরা না কর আক্ষেদ। ব্রহ্মবধ্য পাপ তাতে হইল মিশ্রয়॥

মর্থে জর্ম্ম লইল হইঞা এ নর বানর। দুই পাপে একত্র হইঞা মিশাল।
সেই নর বানর দেহ পাইঞা অতিশয়। দীপ্ত হইঞা গন্ধ তাহে নিকলে বিসাল॥

দেবতারা এই পাপ মুক্তির উপায় ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা রাজসূয় যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন—

জগ্য আরম্ভনা কর ক্ষীরোদের তীরে। যে হইব বলবন্ত ঘোড়া ধরি নিবো।
আনিঞা পাঁক্ষিণি ঘোড়া এড় সভাতলে। তাহা জিনি নিষ্কণ্টক করি ত্রিভুবন ভুঞ্জিবো॥

যজ্ঞ করিতে দেবতারা ক্ষীরোদ সাগরের তীরে মিলিত হইলেন। দিক্‌পতিগণ, পৃথিবীও পাতালের রাজারাও নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থানে আসিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইল—

অধিবাস কৈল ইন্দ্র মুনিগণ নেঞা। সভাতে আনিল ঘোড়া মুনির বচনে।
অধিবাস কৈলত সুরভি দুগ্ধ দিঞা॥ এড়িবত ঘোড়া গর্গমুনি ভুনে॥

চিত্ররথের জন্ম— পৃথিবী জলময়—

ত্রিভুবন জল উদরে শুইঞা ছিল হরি।

পুনরায় পৃথিবী সৃজন করিবেন তাঁহার বাসনা হইল। তাঁহার কর্ণ হইতে মধু ও কৈটভের জন্ম হইল। চারিদিকে জল ভিন্ন অন্য কিছু না দেখিয়া—

মায়াপাতি দুইজন এক নারী হত্র। হেন মতে সঞ্জেগে মধুর গর্ব্ভে হৈলা।
মধুবীর নারী হত্র কৈটভৈ ভুঞ্জয়॥ অঙ্গ চিরি সেই শিশুক বাহির করিল।

মধু, কৈটভ শিশুপুত্র লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নারায়ণকে দেখিয়া আক্রমণ করিলেন। নারায়ণ দুইজনকেই নিহত করিলেন। তাহাদের রক্তমাংসে পৃথিবী সৃষ্ট হইল। কৈটভকুমার পৃথিবীর বাহিরে অন্ধকারময় স্থানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় কৈলাশ পর্বতও কম্পিত হইল। শিব নারদের নিকট ইহার কারণ জানিতে পারিলেন। তখন শিব কৈটভপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বরদান করিলেন। কৈটভপুত্র চিত্ররথ নাম গ্রহণ করিয়া বিশ্বকর্মা নির্মিত নগরে বাস করিতে লাগিলেন। সমস্ত অসুর আসিয়া চিত্ররথের সহিত মিলিত হইল। চিত্ররথ অন্যান্য অসুরদের পরামর্শে দ্রুপদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা দ্রুপদ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দ্রুপদের ধনরত্নের সহিত তাঁহার কন্যা দন্তাবতীকে লইয়া চিত্ররথ নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। দন্তাবতীর গর্ভে চিত্ররথের এক পুত্র হয়—

শুনহ তাহার জর্ম্ম অদ্ভুত কথন। সেই শুম্ভ রাজা মৈল মহামায়ার শেলে।
শুম্ভে দেবীএ পূর্বে হইছিল রণ॥ সেই শুম্ভ রাজা জর্ম্মে দন্তাবতীর উদরে॥

চিত্ররথের এই পুত্রের নাম "দুম্সিল"। এই দুম্সিল—

গোমতীর তীরে গিয়া সেবন্তি শঙ্করে। সাক্ষাত হইয়া শিব দিল তাকে বর।
নিরাহারে কৈল সেবা দ্বাদশ বৎসরে॥ শিম্ভুর বরে হৈল রাজা অজর অমর॥

দুম্সিল গৃহে আসিয়া—

কহিল পিতার আগে যেই পাইল বর। হরষিত সর্বজন আনন্দ পাইল মনে।
শুনিঞা হরিষ পাইল চিত্র নৃপবর। দুম্সিলের জর্ম্ম কর্ম্ম গর্গমুনি ভুনে॥

একদিন দুম্সিল একাকী মৃগয়া করিতে বনে আসিয়াছেন। মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু একটি মৃগও পাইলেন না। সেই বনে শ্যাম নামক বৃক্ষের নীচে সূর্যবংশের বেণু রাজার কন্যা বেলাবতী তপস্যা করিতেছিলেন।

তেজদীপ্ত দেখি দুম্সিল না গেল তথা ডরে।
বাহুড়িঞা গেল বীর আপন নগরে॥

(বাহুড়িঞা = ফিরিয়া যাওয়া)

চিত্ররথ পুত্রের নিকট কন্যার রূপের খ্যাতি শুনিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া বনে আসিয়াছেন—

দেখিয়া কামিনী কামে হত নৃপমণি
ভয়বাসে দেখিঞা নৃপতি।

তপোভঙ্গের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কন্যার তপোভঙ্গ হইল। সম্মুখে চিত্ররথকে দেখিয়া কন্যা অভিশাপ দিলেন—

ক্রোধে কন্যা বোলে বাণী শুন রাজা নৃপমণি তেহো জন্মাইল পুত্র অষ্টজন॥
তোর ক্ষয় করিবে মোর বংশে। চন্দ্রকেতু যেইজন লক্ষ্মণ নন্দন
মোর পিতামহী বংশে জন্মিল হৃষীকেশে তার হাতে তুমার মরণ।

অভিশাপে ক্রুদ্ধ হইয়া চিত্ররথ কন্যাকে ধরিতে যাইলে আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া—

মায়া পাতি বোলে কন্যা শুন নৃপবর। চারি বৎসর আছে আর তপস্যা পুরিবারে।
তপস্যা পুরিতে দেহ দ্বাদশ বৎসর॥ তাবত হেন অনুচিত না কর নৃপবরে॥

চিত্ররথ আশ্বাস দিয়া কন্যাকে লইয়া রাজধানীতে আসিতেছেন—

দৈবের ঘটন পথে খণ্ডন না যায়। মৃগ নাহি সেই মেঘমালা অনুচর।
এক মায়া মৃগ পথে দেখা দিঞা সে পালায়॥ * * * * *
সুবর্ণের মৃগ সেই অতি অনুপাম। সেই সে রাজার কথা শুন একচিতে।
রাজদরশন দিঞা যায় নিজগ্রাম॥ মেঘমালা মহারাজ হৈল যেন মতে॥

পুরাকালে সুকেশ নামে এক রাক্ষস ছিল। তাহার মাল্যবান, মানী, সুমানী নামে তিন পুত্র। এই মাল্যবান— লঙ্কা পাইঞা রাজ্য করে ব্রহ্মার বরে।

মাল্যবানের তিন পুত্র—

মেঘমালা বজ্রদন্ত তালজঙ্ঘ বীরে। দেবগণ জিনিঞা লইল ত্রিভুবনে॥
* * * * * ডরে ভএ দেব পৈশে শিম্ভুর শরণ॥
এইসব বরে দুষ্ট ত্রিভুবন জিনে। শিম্ভু বলে রাক্ষস ক্ষয় করিবে নারায়ণ॥

দেবতারা নারায়ণের নিকট আসিয়াছেন—

শুনিয়া হইল হরি ক্রোধ্ব কলেবর।
যাহ দেবগণ না করিহ ডর॥ মাল্যবানের দূত তথাই আছিল।
আজি আমি রাক্ষস পাঠাইব যম ঘর। দেবের যতেক যুক্তি রাজারে জানাইল॥

দূতমুখে সমস্ত শুনিয়া ক্রোধে মাল্যবান নারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে নারায়ণ তাঁহাকে নিহত করিলেন। পিতার মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া মেঘমালা ও তালজঙ্ঘ গোমতীর তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাহাদের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, দুই ভাই বর প্রার্থনা করিলেন—

বাপের বৈরীমারিতে বর দেহ ত্রিপুরারি।
সেই বর দিঞা শিব হৈলা অন্তরধ্যান।

তারপর— মেঘমালা রাজা হৈলা জিনিঞা ত্রিভুবনে।

মায়ামৃগ অনুসরণ করিতে করিতে সৈন্যসামন্ত লইয়া চিত্ররথ মেঘমালার নগর বেষ্টন করিলেন। দূতমুখে সংবাদ পাইয়া মেঘমালাও চিত্ররথকে আক্রমণ করিলেন। দুইজনে যুদ্ধ হইল—চিত্ররথের হাতে শম্ভুর শূল দেখিয়া মেঘমালা ভয়ে পরাজয় স্বীকার করিলেন। চিত্ররথও নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় নারদমুনি আসিয়া চিত্ররথকে বলিলেন—

চন্দ্রহংস জিনিবারে করহ গমন। তুমার পিতাক মারিঞা গদাধর।
* * * * * লুকাঞা আছে চন্দ্রহংসের উদর॥

নারায়ণকে যদি তথায় না পাও তবে ক্রমে শোণিত পুরীতে বিরোচনাগৃহে, সঞ্জীবনী পুরীতে যমরাজগৃহে, পাতালপুরীতে নাগ দেশে গমন করিয়া অনুসন্ধান করিবে। যদি এই সমস্ত স্থানে দেখিতে পাও—তবে— ক্ষীরোদে যাইহ যথা জগ্য করে পুরন্দর।
তবে ইন্দ্রের জগ্যের ঘোড়া লইহ হরি।
ঘোড়ার কারণে তুমি পাইবে বাপ বৈরী॥

চিত্র রথকে এই উপদেশ দিয়া নারদ চন্দ্র হংসের নিকট আসিয়া বলিলেন— চিত্ররথ তাহার পিতৃহন্তা নারায়ণকে বধ করিতে আসিতেছে। তুমি সাবধানে থাকিবে কারণ —

আছএ তুমার গর্ব্ভে দেব চক্রপাণি।
প্রসন না দিহ তারে শুন নৃপমনি॥

তখন চন্দ্রহংস জিজ্ঞাসা করিলেন—

কেমতে আমার গর্ব্ভে আছে নারায়ণ।

নারদ বলিলেন —গোদাবরী তীর্থে নানাদেশ হইতে লোক স্নান করিতে আসিয়াছে।

হংসবতী অকুমারী আইলা তখনে।

এই তীর্থে দুর্বাসা মুনিও তপস্যা করিতে ছিলেন। হংসবতীও সখীদের সঙ্গে স্নান করিতেছিলেন —হঠাৎ তাহার পায়ের জল দুর্বাসা মুনির গায়ে পড়িল। মুনির তপোভঙ্গ হইল। দুর্বাসা ক্রোধে হংসবতীকে অভিশাপ দিলেন—

অপুরুষে গর্ব্ভধর হইঞা অকুমারী। দারুন মুণির শাপ না যায়ে খণ্ডিল।
* * * * * সেইখানে হংস বতী গর্ব্ভ ধরিল॥

ভয়ে, লজ্জায়, হংসবতী মুনির চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন —

মুনি বোলে কন্যা তুমি কেনে বাস ডর।
তুমার গর্ব্ভে জন্মিব প্রহ্লাদ কুমার॥

বিষ্ণু প্রহ্লাদকে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন—

প্রহ্লাদ বোলে প্রভু শুন গদাধর। হইব তুমার জর্ম্ম দুর্বাসার বরে॥
মনুষের স্ত্রীজেজ জর্ম্ম লাগে বড় ডর॥ বৈকুন্ঠে না রহিব আমি তুমা মর্থে গেলে।॥
হরি বোলে চল পুত্র মহীর ভিতরে। চক্ররূপে রহিব গিঞা তুমার উদরে॥

হংসবতী সেই বনেই থাকেন। যথা সময়ে তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু মুণিকে না দেখিতে পাইয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। তুমিই সেই পুত্র। এই সময়ে—

মহারাজ কামদেব কিরাত অধিকারী।
বিভাকরি লইঞা গেল হংসবতী নারী॥

এইভাবে হংসবতী চলিয়া গেলেন। তুমি একাকী বনে কাঁদিতে লাগিলে। তখন বিষ্ণু পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া তোমার নিকট আসিলেন। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিলেন। যখনে তুমার গায়ে পদ্ম হস্ত দিল।
দ্বাদশ বৎসরের তুমি পুরুষ হইল॥

নারায়ণ তোমাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন—

তুমি বুলিল যদি বরদিবে গদাধর। পূর্ব্বভক্তি জানি হরি অন্যথা না কৈল।
চক্ররূপে বৈস মোর উদরের ভিতর॥ চক্র রূপে নারায়ণ উদরে প্রবেশিল॥

বর দান করিয়া নারায়ণ বৈকুন্ঠে গমন করিলেন। তুমি একাকী বনে থাক, অনাহারে শরীর শীর্ণ। এমন সময়ে কামদেব পুনরায় সেই বনে আসিয়াছেন—

অচম্ভিতে তুহ্মাক দেখিঞা নরপতি। বিষ্ণুতে ভকত দেখি রাজা মহাশয়।
কোলে করি লইঞা রথে নড়ে শীঘ্র গতি তুহ্মাকে করিল রাজা হরিষ অতিশয়॥

নারদ চন্দ্র হংসকে তাহার জন্মবৃত্তান্ত বলিয়া হংসবতীর নিকট যাইয়া বলিলেন —

শুনহ আমার বোল কন্যা হংসবতী। মায় পুত্র দরিশন হইলা তখনে।
দুর্বাসার শাপে এই তুমার সন্ততি। চন্দ্র হংসের পূর্ব্বকথা গর্গমুণি ভুনে॥

নারদ এই সমস্ত বলিয়া প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রহংসও আত্মরক্ষার জন্য পাতালে প্রবেশ করিলেন। চিত্ররথ তখন নগর আক্রমণ করিলেন। কাম রাজার সহিত যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে চিত্ররথের বিপদ দেখিয়া ভক্তের প্রার্থনায় মহাদেবও আসিলেন।

বিষ্ণু ভক্ত কাম দেব কাকে নাহি গণে।
রণেমত্ত কাম যুঝি ত্রিলোচন সনে॥

ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব কামদেবকে ভস্ম করিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে রতি কাঁদিতে কাঁদিতে মহাদেবের চরণে পড়িয়া স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করিলেন

শিব বোলে যদি চাহ এহিত পুরুষে। রুক্মিনী নাম হইব তার ত্রিলোক সুন্দরী।
পাইবেন স্বামী তুমি দ্বাপরের শেষে॥ হরিয়ে করিব বিভা দেব শ্রীহরি॥
গোকুলে জর্ম্মিব বিষ্ণু বসুদেব ঘরে। তাহার উদরে জর্ম্মিব তোর পতি।
লক্ষ্মী জর্ম্মিব আসি ভীষ্মকের ঘরে॥ তুমাক লই যাবে মারিঞা দুষ্টমতি॥

শিবরতিকে এইরূপ সান্ত্বনা দান করিয়া, চিত্ররথকে বর দিলেন— "তুমি ত্রিভুবন বিজয়ী হও।" চিত্ররথ সেই নগরে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও পাইলেন না। তারপর যমপুরে, শোণিতপুরে, নারায়ণকে না পাইয়া, ক্রমে পাতালে নাগরাজ, নিবাতক্ষপুরে নিবাতক্ষ, বরুণ পুরীতে বরুণকে পরাজিত করিলেন কিন্তু নারায়ণকে পাইলেন না। তখন —

ভগবতী পুরী গেল পুরুষ চাহিঞা॥ ইহার পিতাক আমি মারিল পূর্ব্বকালে॥
জানিঞা পুরুষ প্রভু মায়া যধ্যাগিল। তপস্যা করিঞা সেখিল শঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন যুড়ি শরীর প্রসরিল॥ বাপের শত্রু মারিতে তার স্থানে নৈলে বর॥
অসুর পাইঞা প্রভু চিন্তয়ে অন্তরে। এখনে মারিলে ভোলার সত্য ভাঙ্গিব।

ত্রিলোক্য ভিতরে ভোলা অপমান হৈব ॥ তবে স্মরিঞা মারিব নিশাচর ॥
পালিব ভোলার সত্য শতেক বৎসর। (পুরুষপ্রভু=পুরুষোত্তম, বিষ্ণু)

চিত্র রথ বিষ্ণুকে দেখিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বিষ্ণুও কপটতা করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। চিত্ররথ অন্তঃপুরে যাইয়া তথায় কোন লোক নাই দেখিয়া পুনরায় বিষ্ণুর নিকট আসিলেন—

এথা দুআরে নাই পুরুষ রতন। আসটজ দেখিঞা রাজা চিন্তে মনে মন।
তাহা দেখি চিত্র-রথের চমকিত মন ॥ ইহা হৈতে হৈবো মর অবেশ্য মরণ (আসটজ=অদ্ভূত)

এইরূপ চিন্তা করিয়া চিত্ররথ দেশে ফিরিতেছেন—চন্দ্রহংসের কন্যা চন্দ্র প্রেমা চিত্র-রথের ভয়ে পাতালে লুকাইয়াছিলেন — তাহাকে দেখিঞা রাজা হরষিত হইঞা।

কন্যা ধরিবারে যায় বাহু পসারিঞা ॥

তখন আত্মরক্ষার জন্য ছলনা করিয়া চন্দ্র প্রেমা বলিলেন—

উগ্রতপ করি আমি সেবিব্র শঙ্করী। তবে ত তুমার সম হইব সংসারে॥
ভাগ্যে স্বামী পাই যেন চিত্র অধিকারী ॥ অমর হইল তুমি সেবিঞা পশুপতি।
সাত বৎসর গেল মোর পাণ্ড গেলে পুরে। আমি সে অমর হৈতে সেবিএ পার্ব্বতী॥

চিত্ররথ তাহাকে অভয় দান করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। সেই সময় নারদ আসিয়া চিত্ররথকে বলিলেন—বিষ্ণুকে যদি পাইতে ইচ্ছা কর তবে কামরূপ নৃপতি কামধ্বজকে জয় কর। নারদের উপদেশে চিত্ররথ কামরূপে আসিয়াছেন। কামধ্বজ পার্ব্বতীর ভক্ত। কামধ্বজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এমন সময় ভক্তকে রক্ষার জন্য পার্ব্বতী আসিয়া বলিলেন—চিত্ররথ শিবের বরে অজেয়। বিষ্ণু ও তাহার ভয়ে লুকাইয়াছেন, তুমি বিষ্ণুকে রক্ষার জন্য লুকাইয়া থাক। তারপর পার্ব্বতী চিত্র-রথের নিকট আসিয়া বলিলেন— কামধ্বজ তোমার ভয়ে পলায়ন করিয়াছে, বিষ্ণুও এই স্থানে নাই তুমি অন্যত্র বিষ্ণুর অনুসন্ধান কর। চিত্র-রথ বিষ্ণুর অন্বেষণে স্বর্গে আসিয়াছেন—

স্বর্গপুরী গিঞা রাজা কৈল পাতাপাতি। স্বর্গে না পাইল যদি দেব হৃষীকেশ।
তথা না পাইল বৈরী দেবতা শ্রীপতি ॥ ছাড় খার কৈল ভাঙ্গি দেবতার দেশ ॥

ইন্দ্র আদি দেবতা যজ্ঞ করিতে গিয়াছেন, স্বর্গে কেবল দেবপত্নী ও দেব কন্যারা আছেন। চিত্র-রথ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন— না দেখি পুরুষ এথা কিসের কারণ।

কোন উত্তর না পাইয়া ক্রোধে চিত্ররথ ইন্দ্রের কন্যাকেঅপহরণ করিলেন।

কন্যা লইঞা রথে তোলি নড়িল নৃপবর।
পুরী মধ্যে ক্রন্দন উঠিল ঘোরতর ॥

নারদের নিকট কন্যা অপহরণের কথা শুনিয়া ইন্দ্র

জগ্য হলে উঠে ইন্দ্র যাঝিবার মনে। মারিতে নারিবে তুমি চিত্র নৃপবর ॥
* * * * * শঙ্করের বরে দুষ্ট হইল অমর।
তবেত সে গদাধর ইন্দ্রের হাত ধরি। আমার অবধ্য হইল শতেক বৎসর ॥
কহিল কথন কিছু পরাভব করি ॥ এতেক প্রভুর বাক্য শুনিঞা পুরন্দর।
শুন শুন ইন্দ্র তুমি আমার উত্তর। বিরস বদনে জগ্য করে বজ্রে ধর ॥

নারদ বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণু শত্রু চিত্ররথের ধ্বংশের জন্য ব্যাকুল। পুনরায় চিত্ররথকে পরামর্শ দিলেন—

রাজসূই যগ্য কর তুমি পণ্ড ছত্র আনি। * * * * * *
পরম সুন্দর ঘোড়া রাখে সুরমণি ॥ সেই পক্ষ হয়ে বর অজয় দলনি।

আর এক শত্রু তুমার বাঢ়ে পুরন্দর। যাবত সপুন্য জগ্য নাহয় তাহারে।
রাজসূই জগ্য করে তুমা মারিবার ॥ তাবত হরিঞা ঘোড়া জগ্য করহ সত্বরে ॥

তখন চিত্র-রথ নিজ পুত্র দুস্সিলকে বিনা যুদ্ধে এই ঘোড়া চুরি করিতে আদেশ দিলেন। মায়াবী দুস্সিল দেবতার রূপ ধরিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে দেবতাদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইয়া সেই ঘোড়া চুরি করিলেন। ইন্দ্র জানিতে পারিয়া দুস্সিলকে আক্রমণ করিলেন। দুস্সিল ভীত হইয়া —

অশ্ব শালে অশ্ব থুইল যগ্নে লইঞা ॥ অশ্ব শালে অশ্ব থুইল যগ্নে লইঞা ॥
জলে প্রবেশিঞা বীর যুদ্ধ পরিহরি। ইন্দ্রপুরাণ নর শুন একমনে।
হয় লইঞা গেল বীর আপনার পুরী ॥ দুস্সিলে হরিল হয় গর্গমুনিভুনে ॥
আনন্দিত রাজা যজ্ঞ অশ্ব পাইঞা।

যজ্ঞ পণ্ড হইল। দেবতাদের সহিত ইন্দ্র অমরাবতীতে আসিয়াছেন। মনের দুঃখে উদ্যানে বসিয়া আছেন।

সিংঘাসনে না বৈশে ইন্দ্র না বোলে উত্তরে।
নজ্যাএ না যায় ইন্দ্র শচীর মন্দিরে ॥

ইন্দ্রের আগমন সংবাদ পাইয়া শচী —

ইন্দ্রক ভর্ছ্ল আসি গঢ় আরে হঞা। নারীর গঞ্জনা কত সহিবারে পারি।—
ধিক ধিক পরান প্রভু তুমার বীরে। প্রবোধিঞা শচীকে ইন্দ্র পাঠাইল অন্তসপুরী ॥
তুমা রহিতে পুত্রিক হরিলে নিশাচরে ॥ (গঢ় আরে হঞা=ঘাড় বাঁকাইয়া)

ইন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন —

না কর কন্দন তুমি শুন নরপতি ॥ অকস্মাত হইব এই দুষ্টের নিধন ॥
দিন কত রহ ইন্দ্র কন্যার হরন। খর নদী প্রোত যার অবশ্য বালুচরে।
তেন মত্যে হৈর পাপ মরিব সত্তরে ॥

নারদের পরামর্শে চিত্ররথ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। নারদ ইন্দ্রকেও যজ্ঞ পণ্ড করিতে উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র চিত্ররথকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। চিত্ররথ সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন— কারাগারে বন্দিকর নিঞা দেবগণ ॥

তারপর— জগ্য করিতে বৈসে বিপ্র লইঞা রাজন। দেবরাজ বন্দি হৈল অপূর্ব্ব কথন।
দেবসূই জগ্য করে জিনি দেবগণ॥ দুস্সিল বিজয় ভুনে ব্যাসের নন্দন॥

নারদ গোপনে কারাগারে ইন্দ্রের নিকট আসিয়াছেন। মুনিকে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ লজ্জা ও দুঃখে অবনত মস্তকে ক্রন্দন করিতেছেন—মুনি দেবতাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

যেমতে মরিব পাপ বোলি যে উপায়॥ এতেক শুনিঞা ইন্দ্র করিঞা জোরে করে।
রঘুকুল মণি আছে ভাই অষ্টজন॥ চলি যাহ মুনিরাজ নড়হ সত্তরে॥
লবকুশ আদি তারা হরির নন্দন॥ বন্ধনের ঘাএ প্রাণ জ্যএত আমার।
তাহাক আনিলে হয় দুষ্টের মরণ। ঝাটে রথ্যা কর জস থাকিব তুমার॥
না হয় কাতর ইন্দ্র স্থির কর মন॥ (ঝাটে=শীঘ্র)

দেবতাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া নারদ কৈলাশ পর্বতে আসিয়াছেন। পার্বতীর নিকট

ক্রোধ হইঞা বোলে তারে দেবি পার্ব্বতী॥
নাজ নাই পাগলা বেড়াহ দিগাম্বর। মহাদেব বোলি নাম পাড়োহ কোন কামে।
জাক তাক বর দিঞা করহ অমর॥ ডুবাইতে দেবের পুরী ভাঙ্গের ভরমে॥

পার্বতীর তিরস্কারে শিব বৃষ আরোহনে চিত্ররথের নিকট চলিয়া গেলেন। শিবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পার্বতী—

নারদের হস্ত ধরি বাক্য বলন্তি। সত্বরে চলহ লব কুশ রাজার দেশ॥
শুন সাবধানে বাপু আমার আদেশ। কুশ চন্দ্রকেতু নিহ করিঞা যতন।
তাহা হৈতে হৈব এই দুষ্ট নেবারন॥

আরও বলিলেন— সাধারণ বানে এই অসুর নিধন হইবে না—সরস্বতীর নিকট মায়াচক্র বাণ আছে সেই বাণে ইহার মৃত্যু হইবে। কুশ, চন্দ্রকেতু প্রভৃতি লক্ষ্মীর পুত্র, লক্ষ্মীর সাহায্যে সরস্বতীর নিকট হইতে এই বাণ লইতে হইবে। নারদ পার্বতীর উপদেশে অযোধ্যায় আসিয়াছেন। লব, কুশ আদি আট ভাইকে বলিলেন—চিত্ররথের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণ বন্দী—

বন্দি হইঞা তুমাতে সরন।
তুমা বিনে উধারিতে নাই কোন জন॥

নারদের নিকট দেবতাদের দুর্দশা শুনিবা মাত্রই লব, কুশ আদি আট ভাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন নারদ লবকে বলিলেন—

তুমরা ছয় ভাই যাহ রাজ রাখিবারে। তে কারণে যাইতে বোলি তাক রণভূমে॥
কুশ চন্দ্রকেতুক দেহ অসুর জিনিবারে॥ চিত্ররথের প্রাণ আছে চন্দ্রকেতুর তরে।
বিষ্ণু বাজে উতপতি তুমরা অষ্ট ভাই। চন্দ্রকেতুর হাতে হৈব মরণ তাহারে॥
সভা হৈতো কুশের গায়ে নেপ্ত গোসাই॥ ই কারণে তাক বোলি যাইতে সকরে।

নারদ কুশ চন্দ্রকেতুকে লইয়া যাত্রা করিলেন। পথে নারদ কুশকে "মায়াচক্র বাণে"র কথা বলিলেন—এই বাণ অতি গোপনে সরস্বতীর নিকট আছে—এই বাণেই অসুর নিধন হইবে। কুশ চন্দ্রকেতুকে লইয়া নারদ বৈকুণ্ঠে আসিয়াছেন।

নারায়ণ নারদের নিকট কুশ চন্দ্রকেতুর পরিচয় পাইয়া আনন্দে—

দুই শিশু তুলি বৈসায় জানুহুর উপর। কথা হইতে আইল এই শিশু দুইজনে॥
তবে লক্ষ্মীদেবী পুছিল নারায়ণে। কেবা ইহার মাতা পিতা কিবা ইহার নাম।
কি কারণে এথা আইল বৈসে কুনগ্রাম॥

নারায়ণ লক্ষ্মীকে রাম অবতারের কথা স্মরণ করিতে বলিলেন। ইহারা তোমারই পুত্র। পরিচয় পাইয়া কুশ চন্দ্রকেতুকে সাদরে কোলে তুলিয়া লইলেন। সরস্বতী হঠাৎ এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—

এত শুনি কুশ বোলে হোয় সাবধান। আছোক অন্যের কার্য্য ইন্দ্রক বন্দী করে॥
চিত্ররথ মারিতে দেহ মায়াচক্র বান॥ দেব হিত চিন্ত মাও দেহ চক্রবান।
ত্রিভুবন জিনিঞা দুষ্ট খটাইল ঘরে। অসুর বধ্য গেলে হোয়ে সর্বত্রে কল্যাণ॥
(খটাইল ঘরে = গৃহভৃত্য করিল)

কুশের প্রার্থনায় সরস্বতী তখন—

এত অনুমানি দেবী বোলে কুশের তরে। অসুরা মারিঞা চক্র দিহত আমারে॥
নেহ মায়াচক্র পুত্র ছয় মাসের তরে॥ এতবুলি সরস্বতী নঞা চক্রবাণ।
মায়াচক্র ভেদ পুত্র না বোলিহ কাহারে। কুশের হাতে সমর্পিঞা করিল কল্যাণ॥

তখন— মায়ের চরণে দুহে মেলানি করিঞা। কহিল বৃত্তান্ত যত হরির গোচর।
নারায়ণ স্থানে তবে গোচরিল গিঞা॥ রসংসিঞা মেলানি তারে দিল গদাধর॥

মায়াচক্র বাণ লইয়া দুইভাই নারদের সহিত বৈকুণ্ঠ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে নারদ লঙ্কা হইতে মৃত্যুবান আনিতে পরামর্শ দিলেন। রাম এই বাণে রাবণকে বধ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা সকলে সমুদ্রতীরে আসিয়াছেন। এমন সময় অদূরে একটি মায়া মৃগ দেখিয়া কুশ তাহাকে বধ করিলেন। সেই স্থানে জটেশ্বর নামে মুনি তপস্যা করিতেছিলেন। মৃগের রক্ত গায়ে লাগায় তাঁহার তপভঙ্গ হওয়ায় কুশকে অভিশাপ দিলেন—

বৈকুণ্ঠকে জাহ যদি আপনা পুণ্যফলে।
পুনর্বার গর্ভবাস লইবে মহীতলে॥

মুনির অভিশাপে দুঃখিত হইয়া—

কর জোড়ে বোলে কুশ শুন মহামুনি। গোকুলে জন্মিব কৃষ্ণ কংস বধিবারে।
বিনি দোষে দারুণ শাপ কেনে দিলে তুমি॥ তখনে জন্মিব আমি পাণ্ডবের ঘরে॥
আমার কারণে তোর তপ হৈল নাশ। অষ্টভাই পঞ্চ অংশে পাণ্ডুর নন্দন।
পাথর হইঞা কর সমুদ্রকুলে বাস॥ শিশুকালে হৈব মোর পাণ্ডুর নিধন॥
তোর শাপে সূর্য্যবংশে অপযশ মোরে। আমরা সে পঞ্চভাই কুন্তীর সংহতি।
জন্মিঞা করিব যশ পাণ্ডবের ঘরে॥ ধৃতরাষ্ট্র সুতে করিব অনেক দুর্গতি॥

মুনি জটেশ্বরকে এই সব কথা বলিয়া—সমুদ্র পার হওয়ার জন্য—

সরবৃষ্টি করি তবে বান্ধেন সাগর। তুমার পিতা বান্ধিল সেতু গাছ পাথরে।
সরেতে বান্ধিল সেতু সত্যক যোজন। তুমি যে বান্ধিলে সেতু ধনুকের সরে॥
দেখিয়া চমকিত নারদ তপোধন॥ ধানুকী শ্রীখাট এবে নাম সে ইহার।
ইহাতে স্নান কৈলে পাপী এড়াইব কারাগার॥

সেই সেতুতে সমুদ্রপার হইয়া তিনজন বিভীষণের নিকট আসিয়াছেন। বিভীষণ পরিচয় পাইয়া তিনজনকে পাদ্য অর্ঘ দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, মৃত্যুবান লইয়া ক্রমে—

উতরিল গিঞা লোন সমুদ্রতীরে।

অনেক স্তব স্তুতিতেও সমুদ্র পার করিল না। যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে সমুদ্রকে বন্দী করিয়া চিত্ররথের পুরীতে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহারা গোপনে কাম সরোবর তীরে থাকেন। সেই সরোবর তীরই চিত্ররথ কর্তৃক অপহৃত প্রেমাবতী প্রভৃতি কন্যারাও বাস করেন। কন্যাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া চন্দ্রকেতু কুশের অনুমতি লইয়া প্রেমাবতী প্রভৃতি ছয় কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কুশ বিবাহ করিলেননা।

নারদ গোপনে ইন্দ্রকে তাঁহাদের আগমন সংবাদ দিয়া চিত্ররথের নিকট আসিয়া বলিলেন—

জগ্য দেখিবারে আইলো তোমার নিলয়॥
এতদিনে জগ্য কেনে না কর সমাধান।
বিলম্বের কার্য্য নাহে হোতা সাবাধান॥

নারদের উপদেশে চিত্ররথ জয়পত্র লিখিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। দুস্সিল অশ্বের রক্ষক। ঘোড়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছে—

চিত্ররথের নামে ঘোড়া কেহো নাহি ধরে।
ত্রিভুবন জম্মাইঞা ঘোড়া দুস্সিল বীরে।
ঘোড়া লইঞা প্রবেশিল আপনার পুরে॥

ঘোড়া লইয়া দুস্সিল সরোবর তীরে আসিয়াছেন। জয়পত্র পড়িয়া চন্দ্রকেতু ঘোড়া বাঁধিলেন।

দুস্সিলের সহিত যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে দুস্সিল নিহত হইল। ক্রমে চিত্ররথের অন্যান্য সেনাপতিরাও যুদ্ধ করিতে আসিল। কুশ সকলকেই নিহত করিলেন। যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া দুঃখে, ক্রোধে চিত্ররথ শিবের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন। রাজা মুকুন্দও কুশ চন্দ্রকেতুকে সাহায্য করিতে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন। ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে এমন সময়ে বিষ্ণু বায়ুরূপে আসিয়া কুশের কাণে কাণে বলিলেন—

শুন শুন কুশ পুত্র কহি বিবরণ। এক তিলের তরে যদি কাটহ শঙ্কর।
শিব সে থাকিলে নহে চিত্রের মরণ॥ তবেত জিতে পার চিত্র নিষ্পবর॥

এই কথা শুনিয়া কুশ চন্দ্রকেতু আকাশে উঠিয়া মায়া যুদ্ধে শিবের মাথা কাটিলেন। তারপর চিত্ররথকে বধ করিয়া দেবতাদিগকে মুক্ত করিলেন। ব্রহ্মা পুনরায় শিবের জীবন দান করিলেন। শিব জীবিত হইয়াই ভক্তের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা তখন শিবের হাত ধরিয়া নিবৃত্ত করিলেন।

চিত্ররথের অপর পুত্র কাল যবনকে রাজ্য দান করিয়া দেবতারা স্বর্গে গমন করিলেন। আনন্দ উৎসবে কিছুদিন কাটিল। ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্র পুনরায় সেই অসমাপ্ত যজ্ঞ সমাপন করিলেন। যজ্ঞ সমাপন করিয়া ইন্দ্র মুচুকুন্দকে বর দিতে চাহিলেন—

মুচুকুন্দে বোলিল তবে যদি দিবেন বরে। কাচা নিদ্রা যেই মোর করিব ভঞ্জন।
তুমার বরে নিদ্রা মুঞি জাঙ নিরন্তরে॥ আমা দরশনে ভস্ম হৈব সেই জন॥

ইন্দ্র তাঁহাকে এই বর দিলেন। তারপর কুশকে বলিলেন—

বিষ্ণুর নন্দন তুমি বিষ্ণুর সমান। তভু বর দিবো তোমাকে দিঢ় কৈল মনে।
তুমাক বর দিতে নাহি আমার পরাণ॥ যে বর মাগিব তাহা দিব ততক্ষণে॥

তখন কুশ বলিলেন—

তুমার বরে নিবংশ মুঞি হভত জগতে॥ জগ্য করি তুষিব ব্রাহ্মণের রিনে।
* * * * * ভোজ্য করি সুঝিব কুটুম্বের রিনে।
পূর্ব্ববংশ পুরুষ মোর যতেক হইল। যাহা হৈতে নিস্তরে মোর পর পিত্রিগণে।
রিন কর্জ্জ থুইঞা সর্গবাস হৈল॥ বংশ হৈলে রিন থাকে শুন সুররায়।
আমার জর্ম্ম হৈল বংশ অবসানে। সুপুরুষ হৈলে পাছে সে রিন খণ্ডায়॥
আমিত সুঝিব রিন ইচ্ছা হৈল মনে॥ সংসারের মধ্যে রিনক বড় ডর।
দেব রিন সুঝিল এই বধিঞা আসুরগণে। জর্ম্মে জর্ম্মে নাহি খণ্ডে বাঢ়ে ততপর॥

ইন্দ্র কুশের প্রার্থিত বরই দান করিলেন।

দেবতাদের নিকট বিদায় লইয়া কুশ, চন্দ্রকেতু পত্নীদিগের সহিত অযোধ্যায় আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল পর সকলে আবার মিলিত হইয়াছেন। অযোধ্যানগরী আনন্দোৎসবে মত্ত। এমন সময়—কিরাত রাজ মেঘনাদ তাঁহার ছয় কন্যা লইয়া লব আদি ছয় ভাইকে কন্যাদানের বাসনায় অযোধ্যায় আসিলেন। মেঘনাদের প্রার্থনায় লব মেঘবতীকে, লক্ষ্মণ পুত্র ভাস্কর, চন্দ্রকান্তিকে, ভরত পুত্র পুষ্কর কৃত্যাবতীকে ও সুবাহু রতিসুরাকে, শত্রুঘ্ন পুত্র—শত্রুঘাতিকে, সরভীকে ও অঙ্গদ, হেমবতীকে, বিবাহ করিলেন। কুশ আর বিবাহ করিলেননা—লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতু পূর্বেই বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহের আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়া কিছুদিন কাটিল। একদিন নারদ আসিলেন। তাঁহার উপদেশে লব রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। তারপর অনেকদিন কাটিল। ব্রহ্মার আদেশে হঠাৎ একদিন নারদ আসিয়া লবকে জানাইলেন—তাহাদের পৃথিবীতে বাসের

কাল পূর্ণ হইয়াছে এখন স্বর্গে যাইতে হইবে।

নারদের নিকট ব্রহ্মার আদেশ শুনিয়া লব সুমন্ত সারথীর পুত্র "লোচন"কে অযোধ্যার রাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন। তার পর লব আদি আটভাই পত্নীদিগের সহিত অগ্নিতে মানবদেহ বিসর্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। স্বর্গে তাঁহারা বিষ্ণুর নিকট বৈকুণ্ঠেই বাস করিতে লাগিলেন।

পৃথিবীতে আবার দৈত্য দানবের অত্যাচার আরম্ভ হইল। পৃথিবী ব্রহ্মার নিকট আসিয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলেন ব্রহ্মা তখন বিষ্ণুকে পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণু তখন দশরথকে ডাকিয়া বলিলেন—

শুন মহাশয় রাজা চিন্ত দেব হিত। সতরেত জর্ম্ম গিয়া নেহ মথুরারে ।।
আপনে জর্ম্ম গিঞা লেহ পৃথিবীত॥ এক অংশে জর্ম্ম নেহ মথুরা নগরে।
বেণ্ডসেন গোপ তার নারী তারাবতী। নন্দঘোষ বুলি নাম হইব তুমারে ।।
তার ঘরে জর্ম্ম গিঞা লেহত নৃপতি।। বসুদেব ঘরে মুই জনম লইয়া।
বসুদেব বুলি নাম ঘুসিব সংসারে। থাকিব নন্দের ঘরে কংসকে ছলিয়া ।।

কৌশল্যাকে বলিলেন—

উগ্রসেন অপুত্রক রাজা মথুরা নগরে। দৈবকী বুলিয়া নাম হইব তুমার ।।
তুমি কর্ম্ম নেহ দেবি তাহার উদরে ।। বসুদেব বিবাহ দেবি হৈব তুমারে।
তোমার উদরে জর্ম্ম হইব আমার।

কৈকেয়ীকে বলিলেন —

যদুসেন গোত্তাল আছে গোকুল নগরে। দৈবকির সাত পুত্র মারিব কংসাসুরে।
তুমি জর্ম্ম নেহ দেবি তাহার ঘরে ।। অষ্টম গর্ব্ভেত জর্ম্ম হইব আমারে ।।
যোশদা বুলিঞা নাম হইব তোমারে। দৈবকির গর্ব্ভে আমি জনম লইয়া।
নন্দ ঘোষ পরিণয় করিব তোমারে।। থাকিব তোমার ঘরে কংসক ভাণ্ডিয়া।।

সুমিত্রাকে বলিলেন —

রোহিনাথ গোপ আছে মথুরা নগরে। রোহিনী বুলিয়া নাম হৈবেন তুমারে।
তুমি জর্ম্ম নেহ গিঞা তাহার ঘরে।। এক অংশে জর্ম্ম মোর তোমার উদরে ।।

তারপর লব, কুশ আদি আট ভাইকে—

মধুভাষে বোলে হরি শুন পুত্রগণ। তাহার মাহিষি আছে মাদ্রী জ্যেষ্ঠ কুন্তী।।
দেব কার্য্য সাধিতে বাপু হয় উপাসন।। অপুত্রক হই আছেন পাণ্ডু নরপতি।
হস্তিনা নগরে আছে পাণ্ডু নরপতি। তার ঘরে জর্ম্ম লেহ শুন নরপতি।।

তোমরা আট ভাই পাণ্ডুর গৃহে পাঁচ ভাই হইয়া কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে বলিতেছি।—লবকে বলিলেন—ধর্ম্মের ব্রীজে তবে কুন্তীর উদরে। মহারাজা হৈব তুমি শুন মহাবীর।

এই জর্ম্ম রাজা হইব তুমারে।। পৃথিবীর মধ্যে নাম হৈব যুধিষ্ঠির ।।

ভাস্কর, পুষ্কর, অঙ্গদকে বলিলেন—

তিন হু প্রবেশ সে পবন কলিবরে ।। কুরু রাজ বধ্য সে হইব তুমার হাতে।
পবনের ব্রীজে আর কুন্তীর উদরে। একারনে তুমাক পাঠাই পৃথিবীতে।।
ভীম সেন বুলি নাম হইব তুমারে ।।

কুশ চন্দ্রকেতুকে বলিলেন—

দুই জন এক হইয়া জর্ম্ম পৃথিবীতে। ভূমি ভার খণ্ডাইতে তুমি যুধাপতি।
ইন্দ্রের ব্রীজে কুন্তীর উদরে। তুমার পক্ষ হৈয়া আমি হইব সারথি ।।
অর্জুন বুলিয়া জর্ম্ম হইব তুমারে।।

সুবাহু, শত্রুঘাতিকে বলিলেন—

আমার বচন শুন তুমি দুই বীরে। অশ্বনি কুমার ব্রীজে মাদ্রীর উদরে।
প্রবেশহ অশ্বনি কুমারের শরীরে।। নকুল সহদেব নাম হইব তুমারে ।।

তারপর বিষ্ণু লব, চন্দ্রকেতু প্রভৃতি সাত ভাই-এর মেঘবতী আদি দ্বাদশ পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিবা সর্পে থাকিবে কিবা যাবে স্বামী সনে আমিয় যাইব প্রভু স্বামীর সংহতি।
হরির বচনে মেঘবতী বোলিল বচনে ।। ত্রিভুবনে স্বামী বিনে অন্য নাই গতি।।

তখন বিষ্ণু বলিলেন—

দ্বাদশ কন্যাত্র হোয় এক কলেবর।
একত্র হএ্যা জর্ম্ম গিয়া মহীর ভিতর ।।
পঞ্চস্বামী মধ্যে তুমি হৈবা এক নারী।
তুমা হেন পুণ্যবতী নাই তিন পুরী

ইহা শুনিয়া মেঘবতী বলিলেন —

পঞ্চ স্বামীর এক নারী বহুল খাঙ্কার।
খাঙ্কার=খাঁখার—কলঙ্ক, নিন্দা,

বিষ্ণু তখন বলিলেন—

তুমারে আনিবে অর্জুন তেজ্যা রাধাচত্রে ।। মা-এর বাক্য কেহো নারিল পংথিতে।
মায় অদ্রসনে তুমা নয়া পঞ্চজনে। পঞ্চ ভাত্র তুমাক বিভা করিবেন তবে ।।
এক বস্ত পাই বুলি কহিবেন কানে।। শীঘে জর্ম্ম নেহ গিএ্যা দুর্পদের ঘরে।
কুন্তী-এ কহিব যেই পাইলা বস্তুযোগ। দ্রোপদী বুলিয়া নাম হইব তুমারে ।।
সেই দ্রব্য পঞ্চ ভাই কর উপভোগ ।।

লক্ষ্মী সরস্বতীকেও বলিলেন—

শুনহ মহাদেবি নক্ষি আমার বচন। ছত্র অবতারে নক্ষি আমার সংহতি।
এক অংশে জর্ম্ম গিএ্যা ভিষ্মক ভুবন ।। ভূঞ্জিল সংসারে সুখ পরম পিরিতি ।।
আর সাত অংশে জর্ম্মিহ রাজ ঘরে। এই অবতারে সে তুমাক সঙ্গে নএ্যা।
স্বয়ম্বর করি বিভা করিবো বারে বারে ।। ভুঞ্জিব নানা সুখ ভূমি ভার খণ্ডাইএ্যা ।।
শুনহ সরস্বতী তুমি আমার বচন। তুমি জর্ম্ম নেহ গিএ্যা সত্রাজিত ঘরে।
আপনে জন্মাহ সত্রাজিতের ভুবন ।। সত্যভমা বুলি নাম হইব তুমারে ।।

বিষ্ণুর আদেশে ক্রমে সকলেই আসিয়া মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিলেন। কংসও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কংসের জন্ম কথা—

দুঃশীল নামে এক দৈত্যরাজ আকাশ পথে বিচরণ করিতে করিতে উগ্রসেন পত্নী মলয়া দেখিয়া মুগ্ধ হন। পরে উগ্রসেন বেশে আসিয়া মলয়াকে উপভোগ করে তাহাতে কংসের জন্ম হয়। মলয়া পরে জানিতে পারিয়া অভিশাপে সেই দৈত্যকে ভস্ম করেন। কংস পূর্ব জন্মে কালনেমি

ছিলেন উগ্রসেনও মলয়ার নিকট সমস্ত জানিয়া —

কোপে উগ্রসেন পুত্র না করেন্তি কোলে।

পিতার এইরূপ অনাদরে কংস মাতার নিকট সমস্ত জানিয়া তপস্যা করিতে বনে গমন করেন। কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব বর দিতে চাহিলে কংস বলিলেন —

পৃথিবীত আছে যত যত নরপতি। আপনে আমাক যেন বধোন শ্রীপতি ।।
সবারি উপর মোকে কর উমাপতি ।। মিত্র হইয়া ভাবিলে ঝাটে মুক্তি নত্র।
যদি বা মরণ মোরে থোয় উমাপতি। শত্রু হইয়া চিন্তিলে ঝাটে মুক্তি হত্র ।।

মহাদেব তাহাকে এই বর দান করিলেন। কংস জরাসন্ধের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। রাজা হইয়া অন্যান্য দৈত্যদের সহিত মিলত হইয়া পৃথিবীতে নানা রূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে পুথি সমাপ্ত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ উপাখ্যানের শেষে নানারূপ ফল শ্রুতি পাওয়া যায়। পুথির শেষের ফলশ্রুতিটি এইরূপ —

হেন কথা অমৃত শুন হ এক মনে। হেনত অমৃত কথা যেবা জনে গাত্র।
রোগীর খণ্ডিব রোগ বন্দির বন্ধনে ।। তাহাক আনিতে ইন্দ্র বিমান পাঠাএ।
এড়াইব নরক যদি শুন এক মনে। যত জন করে আর যতেক গো দান।
যেই জন পড়ে শুনে করিয়া যতনে ।। তত ধম্ম হএ শুনে ইন্দ্র সুই পুরান ।।
তার মৃত্যু কালে যম যাইব আপনে।

পুথিতে, মাধবী, গুঞ্জারী, পাহাড়ী, তোড়ী, প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে, মনে হয় জনগণের আনন্দ দানের মাধ্যমে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বও পাপ পুণ্যের ফলা ফল বুঝাইবার জন্য পূর্বে ইহা পাঁচালীর মতই গান করা হইত।

"ইন্দ্র রাজ সুয় যজ্ঞ" পুথিতে কবির কল্পনা ধ্যান ধারণা অপূর্ব প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বিবিধ পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণে কবি যে নব পুরাণ রচনা করিয়াছেন তাহাতে কবি কল্পনার সংগে যুক্ত হইয়াছে কবির মননশীলতা ও পাণ্ডিত্য। কবি আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া অতিসন্তর্পণে সুশৃংখলিতভাবে এই পুরাণ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে হয়ত কবিকল্পনার উদ্দাম বিকাশ অথবা উচ্চাঙ্গ কবি কৃতির পরিচয় সর্বত্র নাই তবু আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত একজন অখ্যাত পল্লীকবির পক্ষে "ইন্দ্ররাজ সুয় যজ্ঞে"র মত কাব্য রচনা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

আমরা কবির সংযম, মনন, এবং কল্পনার প্রাচুর্য দেখিয়া বিস্মিত হই এবং আপন অলক্ষেই উক্ত কবির উদ্দেশ্যে স্বীয় মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া যায়।

জগদীশচন্দ্রের কবিতা

মুরারি ঘোষ

শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধের দিকটাই বড় এমন এক অতিসুলভ ধারণা অনেক কাল থেকে চলে আসছে। শিল্পের সৌকুমার্য বিজ্ঞানের সত্যে নাকি প্রতিষ্ঠিত হয় না। অহেতুক বাস্তবের অসহ্য প্রকাশে শিল্পের মনোরম পরিবেশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তাছাড়াও শিল্পানুভূতির মধ্যে যে প্রশান্তি, অনুভূতির পূর্ণতা, বিজ্ঞানে নাকি তা পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের যুগে আমরা আমাদের এই মনকেই হারিয়ে ফেলেছি। এমন সব নিদারুণ অভিযোগ বহুকাল বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে। অনেক কিছু পাওয়ার সঙ্গে অনেক কিছু হারানোর আক্ষেপ আজ বড় হতে চলেছে এই বিশ্ব সংকটে। কবি শিল্পীদের তিলে তিলে গড়ে তোলা এই তিলোত্তমা পৃথিবীর নগ্ন নিষ্ঠুর রূপের জন্যে দায়ী করা হয় বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞানী বনাম শিল্পী সাহিত্যিকের এই অলক্ষ্য লড়াইয়ের কোন হেতু নেই। আসলে বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে কোন সত্যকার বিরোধ কেউ খুঁজে পাবে না। বিজ্ঞান ও শিল্পের রাজ্যে নিশ্চয়ই এক সীমারেখা রয়েছে। কিন্তু সীমারেখা পেরিয়ে কেউ কারুর অধিকারে তিলমাত্র অগ্রসর নয়। বরঞ্চ বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিকর্মের নিবিড় সম্পর্কের কথা জগদীশচন্দ্র অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করে গেছেন। স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথও।

কম্পাসের কাঁটা দেখে আইনস্টাইনের মন ভয়ানক চমক খেয়েছিল। এ অভিজ্ঞতার কথা বিজ্ঞানী বর্ণনা করে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। আইনস্টাইনের পিতা যখন শিশু আইনস্টাইনকে কম্পাসের ব্যবহার বুঝিয়ে দিলেন তখন এক নতুন জগতের চেহারা আইনস্টাইনের সামনে উন্মোচিত হল। এই নতুন অভিজ্ঞতাকে অবাক মন নিয়ে অভ্যর্থনা করে নিলেন তিনি। নতুন চেতনার আলোকে পুরনো ধারণা বদলে নিতে হয়। নতুন ভাবনা দিয়ে গড়ে নিতে হয় নতুন ভাবনার জগৎ। প্রথম পরিচয়ের পর অবাক মনের প্রাথমিক পরিবেশ, মোহাবেশটুকু ঘুচে যায়—তখনই যা ঘটে আইনস্টাইনের ভাষায় তা হল, 'ফ্লাইট ফ্রম ওয়ান্ডার'। এ অভিজ্ঞতা শিল্পীর ও ঘটে, বিজ্ঞানীরও ঘটে। নতুন অভিজ্ঞতার চমক উত্তীর্ণ হয়েই কবি তার স্বরূপ প্রকাশ করেন লিপি মাধ্যমে। প্রতি শিল্পই হল চমক খাওয়া মনের মোহমুক্তি। বিজ্ঞানের রাজ্যের আইনস্টাইনকেও এ চমক মুক্তি খুঁজে নিতে হয়েছে অনেকবারই।

জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে (১৭ই মে : ১৯০১) লিখলেন, "আমি অনেক সময়ে একেবারে আশ্চর্যে অভিভূত হইয়াছি কে আমাকে যেন এক রহস্য হতে অন্য রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সত্য দেখাইতেছে।" জগদীশচন্দ্রের একেকটী গবেষণা, একেকটা আবিষ্কারে বারবার তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছে। নতুন আলোকের ইশারা পেয়েছেন প্রতিবারই। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিপত্রে। (প্রবাসী, ১৩৩৩) তিনি বারংবার তা স্বীকার করেছেন।

জগদীশচন্দ্র মোট ১১টা বইতে তাঁর বিভিন্ন গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। জগদীশচন্দ্রের এক একটা গবেষণার ফল অজস্র পথের আভাস ও চিন্তার খোরাক নিয়ে আসতো। একটা আবিষ্কার বা সিদ্ধান্ত থেকে তিনি অন্য সম্ভাব্য পথে ঝাঁপ দিতে পারতেন। জগদীশচন্দ্রের প্রত্যেক গবেষণার মধ্যে এক সাধারণ যোগসূত্র রয়ে গেছে। তাঁর প্রতিটি খণ্ড গবেষণার, বা বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের এক পূর্ণ সমবেত রূপের কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাঁর আবিষ্কার, জীবের প্রাণতত্ত্বের ধারণার সঙ্গে জড়ের সূক্ষ্ম যোগাযোগ, বৃক্ষ, প্রাণী ও

মানুষের প্রাণলীলার অপ্রত্যক্ষ ঐক্য সূত্র, ও অজৈব পদার্থ দিয়ে জৈব দেহের আংশিক প্রতিরূপের গঠন। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সমবায়ে জগদীশচন্দ্র এক কৃত্রিম চোখের সৃষ্টি করেন। ঐ কৃত্রিম চোখ দিয়ে মানুষের চোখের সমস্ত কাজই সম্পন্ন হতে পারতো। বিদ্যুৎ-প্রকৃতির গবেষণা করতে গিয়ে জড়দেহের ওপর বিদ্যুতের আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করলেন। লক্ষ্য করলেন জৈবদেহের সঙ্গে এ প্রতিক্রিয়ার রয়েছে সমান্তরাল সমধর্মিতা। বাহিরের বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রয়োগে জীব ও জড়ের মধ্যে সমার্থক সাড়া পেলেন। প্রাণীদেহের শারীর-সংস্থানের প্রতিরূপ গাছের দেহে আবিষ্কার করলেন। গাছের বিভিন্ন জৈবক্রিয়া, তাদের জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, নিদ্রা, আঘাত, শোক এসব কিছুর অস্তিত্ব তিনি প্রমাণ করলেন যন্ত্রের মাধ্যমে। তাঁর সমস্ত আবিষ্কারগুলো একটা মৌল চিন্তাধারা অনুসরণ করেই রচিত। একটা সমগ্র বিশাল পটভূমিকায় জগদীশচন্দ্রের খণ্ড খণ্ড গবেষণা এক সম্পূর্ণ ঐক্য নিয়ে বাঁধা পড়বে।

জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টির সত্য যখন সমগ্রতার বাঁধনে পাব, তখন সেখানে বিজ্ঞানীর সঙ্গে শিল্পীর তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্যে অখণ্ড ভাবনার ইশারা। তিল তিল রূপে তিলোত্তমা। এখানে বাহুল্য হবেনা যদি এক বিখ্যাত চিন্তাশীলের উদ্ধৃত করি :

The task of every student of nature—artist and scientist—is to see the world as a whole in all its interconnections, and to see it in all its detail. The particulars have to be isolated and then subsumed within the general; the general has to be isolated and then filled with its particulars. (Hyman Levy & Helen Spalding: Literature for an age of science).

কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর মননশীলতার এক তুলনামূলক আলোচনায় লেভীর আর এক যুক্তির উল্লেখ আমরা করতে পারি। লেভী বলছেন, বিজ্ঞানী যখন নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবনা করেন তখন অনেক সময়ে পুরণো তত্ত্বকে বিদায় নিতে হয়। নতুন শিক্ষার আলোকে অতীত অজ্ঞানতার কিংবা ভুল তত্ত্বের অবসান ঘটে। পুরণো দৃষ্টিভঙ্গি, পুরণো মূল্যায়ণ, পুরণো অর্থের সমাপ্তি ঘটে। বিজ্ঞানীর অবস্থার সঙ্গে লেখকের অবস্থা এখানেই তুলনীয়। প্রতিটি সৃষ্টি মূলক রচনাকে সৃষ্টির এক নতুন এক্সপেরিমেন্ট রূপে কল্পনা করা যায়। কোন সার্থক সৃষ্টিমূলক রচনা দুবার করে জন্মলাভ করে না। আর তার জন্মমুহূর্তে নতুন পরিবেশ রচিত হয়। সৃষ্টি হয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির, নতুন মূল্যমানের এবং নতুন প্রতিক্রিয়াও জন্ম নেয়। আসলে প্রতিটি নতুন রচনাই পুরণো রচনার সমালোচনা।

এইতো হল বিজ্ঞানী ও কবিচিত্তের ঐক্য। তত্ত্বের কথা। কিন্তু আসল জীবন দিয়ে এই ঐক্য যিনি প্রকাশ করলেন তিনি জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় বন্ধুত্ব সেই ঐক্যের আর এক প্রকাশ। এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখছেন। (১৫ই অক্টোবর, ১৯০১), "তুমি লিখিয়াছ, আমার বন্ধুত্ব তোমাকে এমন প্রবলভাবে ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্বে জানিতে না। হয়তো জাননা যে আমার অবস্থাও ঐরূপ। কেন আকৃষ্ট হইয়াছি তাহার কারণ এই যে হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা যাহা আমার মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।" কবিমনের অখণ্ড সত্যের প্রকাশ বিজ্ঞানী-হৃদয়ের সত্য উদ্ঘাটনে সহায়ক হয়েছে। কবির সৃষ্টির সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগ স্থাপনে জগদীশচন্দ্র যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। বিলেত থেকে তিনি চিঠি পাঠাতেন গল্পের তাগাদা দিয়ে কবিতার তাগাদা দিয়ে : "তোমার নতুন লেখা পড়িবার জন্য ব্যস্ত আছি, বঙ্গদর্শন পাই না। মাঝে মাঝে

তোমার গল্প পুনঃ পুনঃ পড়ি। আর ২।১ খানা কবিতার পুস্তক আছে তাহা পড়ি। কিন্তু যেগুলি সঙ্গে নাই তাহা পড়িবার জন্য সর্বদা ইচ্ছা হয়।" (১২ই জানুয়ারী, ১৯০২)

রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিদেশে প্রথম প্রচার করেছেন জগদীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদ করে তিনি শুনিয়েছেন বিদেশী বন্ধু মহলে। তাদের প্রত্যেকের 'অ্যাপ্রিসিয়েসনের' খবর চিঠি মারফৎ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। আগেই তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন ওরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু তোমার গল্পগুলি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও তুমি সার্বভৌমিক।" ঠিক সেই যুগে এই শতাব্দীর প্রথম পাদে রবীন্দ্র প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা আর কারুর দ্বারা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রই প্রথম ঘোষণা করলেন, "তুমি সার্বভৌমিক।" তিনি উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, "তবুও এক বিশ্বাস যে আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই। সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়াছি।" রবীন্দ্রনাথের ওপর এতখানি আশা, রবীন্দ্র প্রতিভায় এই নিশ্চিত বিশ্বাস এর আগে আর কেউ স্থাপন করতে পারেননি।

কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর যোগাযোগের সহজ সূত্রের সন্ধান রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন। জগদীশ চন্দ্রের মনীষার উল্লেখে তিনি একবার বলেছিলেন, ঃ

"বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে। কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া আসার দেনা পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেইজন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিলনা, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্যে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুইদিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে।"

(জগদীশচন্দ্র ঃ রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড)

জগদীশচন্দ্রের প্রবৃত্তির মধ্যে সাহিত্যের অংশ যে যথেষ্ট ছিল বিশ্বকবির এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতিই তার পরিচয় দেবে। য়ুরোপ থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠিগুলো (প্রবাসী, ১৩৩৩ দ্রষ্টব্য) তাঁর আত্মজীবনীর মূল্যবান দলিল। কেমন করে তিনি একাকী য়ুরোপীয় বিজ্ঞানীদের বিশাল প্রতিকূলতা জয় করে আপন গবেষণার স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছিলেন তার রোমাঞ্চকর বিবরণ পাই এদের মধ্যে। তাঁর চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সংগ্রামের মধ্যেও তিনি কোমল হৃদয়, অনুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে উপেক্ষিত স্বদেশ-আত্মার ধ্যানেও মগ্ন ছিলেন। তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যেই ইতস্তত ছড়িয়ে আছে এই তীব্র আবেগ প্রবণ কাব্যোক্তি গুলোও।

—'আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে।'

—'তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসন পরিহিতা মূর্ত্তি সর্বদা দেখিতে পাই, তোমাদের সহিত আমি সর্ব্বদা তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় নেই। আমি ভাষায় সে সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।'

—'সেদিন তোমার কতকগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম। সেই শিলাইদহের প্রান্তর ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি?'

গাছপালার জীবনের এক কবিত্বময় নাম তিনি দিয়েছেন, নির্ব্বাক জীবন। এই নির্ব্বাক জীবনপ্রসঙ্গে যখন তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ফেলে কলম ধরেছেন, তখন দেখি, এক কবিমানস সচকিতঃ

"এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে তাহাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিল।"

গাছপালার অব্যক্ত জীবনের পরিচয়লিপি যেমন তাঁর যন্ত্রে ধরা পড়েছিল তেমনি কলমের মুখেও তা উৎসারিত। তাঁর অটুট কবিত্বের প্রকাশ তাঁর অপূর্ব নিবন্ধ গ্রন্থে (অব্যক্ত) সংকলিত।

জগদীশচন্দ্র কোন কবিতা না লিখলেও মহৎ কবির সমস্ত উপাদানেই তাঁর চৈতন্য ব্যাপ্ত ছিল। জগদীশচন্দ্র এক কৃত্রিম চোখ তৈরী করেছিলেন। মানুষের চোখের সমস্ত প্রক্রিয়া এই কৃত্রিম চোখের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারত। এই চোখ আর ফটোগ্রাফির উল্লেখ করে জগদীশচন্দ্র এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "চক্ষে যে ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায় কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু Photoর ছবি একেবারে অপরিবর্তিত রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া এই মানবিক আড়ষ্টতা সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য Experiment-এ সফলতা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল, তুমি আমার আবিষ্কার চুরি করিয়া ইতিপূর্ব্বে কবিতারূপে প্রচার করিয়াছে। সুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকা বিদ্ধ করিতে যাইতেছিল তখন তাহার মনে হইল যে চিরঅন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত হইয়া থাকিবে।" (৩০শে মে, ১৯০২)

রবীন্দ্রনাথের মানসীর কবিতা সুরদাসের প্রার্থনা, এ কবিতার সুরদাস প্রণয়াসক্তির আবেগে অনুতপ্ত। যে মূর্তিকে তিনি মনে পুজো করেন অতৃপ্ত বাসনার দুর্বল মুহূর্তে তাকে তিনি প্রেমিকারূপে কল্পনা করলেন। যে চোখে সুরদাস অনুপম রূপমাধুরী উপভোগ করলেন, অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যথায় সুরদাস সেই চোখ শলাকাবিদ্ধ করে সে ছবি চিরকালের জন্যে অপরিবর্তনীয় রাখার কামনা জানালেন, ঃ

তবে তাই হাক, হয়ো না বিমুখ,
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি
হৃদয়-আকাশে থাক না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি!

(সুরদাসের প্রার্থনা ঃ মানসী)

দেহহীন জ্যোতি ফটোগ্রাফির প্লেটেই চিরমুদ্রিত থাকে। কিন্তু মানুষের চোখের পর্দায় কোন ছবি অপরিবর্তনীয় থাকে না। সচল চিত্রলিপি প্রতি মুহূর্তে তার রূপ পাল্টায়। চোখের যান্ত্রিক কলাকৌশল আর ফটোগ্রাফির কলাকৌশলের প্রভেদ এখানেই। দৃষ্টির যদি অবসান ঘটে তবে শেষ দৃষ্টিপাতের উপকরণ ফটোগ্রাফির প্লেটের মতই স্মৃতির পর্দায় স্থায়ীরূপ লাভ করে। সুরদাস সেই আকাঙ্ক্ষাই করেছিল। অবশ্য ফটোগ্রাফির এই ধারণা তখন কমিনে ছিল না। তিনি তাঁর হৃদয়ের আবেগে যা বলেছেন বিজ্ঞানী তাঁর বিজ্ঞানিনিষ্ঠ মনে তা বিচার করেছেন। এখানেই বিজ্ঞানীর আশ্চর্য রসোপলব্ধির প্রকাশ, কাব্যানুভূতির সঙ্গে বিজ্ঞানচিন্তার অপরূপ সমন্বয়। অন্তত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে বিজ্ঞান-পটভূমিকায় বিচার করার ক্ষমতা মহৎ কবির পক্ষেই সম্ভব।

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, 'ইলোকোয়েন্স ইজ্ হার্ড, পোয়েট্রি ইজ্ ওভারহার্ড'। জগদীশচন্দ্রের ইলোকোয়েন্স শোনার জন্যে য়ুরোপে যথেষ্ট জনসমাগম হত। 'নেচার' পত্রিকার (নেচার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭) মতে জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশে, বক্তৃতামালায় য়ুরোপের বিজ্ঞানী, অবিজ্ঞানী, পণ্ডিত, অপণ্ডিত জনসাধারণের যতখানি হৃদয় জয় করতে

পেরেছিলেন তখনকার কোন বিজ্ঞানী এতটা আশা করতে পারেন নি। য়ুরোপের অধিকাংশ দেশ থেকে তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল। অবিজ্ঞানী সাধারণ জনেরাও বক্তৃতা শোনার জন্যে ভীড় করত। প্যারিতে ইলোকোয়েন্ট জগদীশচন্দ্রের শ্রোতা ছিলেন 'রম্যাঁ রলাঁ, রয়াল সোসাইটীতে এসেছিলেন 'বার্ণাড শ'। আর এই ইলোকোয়েণ্ট জগদীশচন্দ্রের কবিকৃতি কান পেতে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জগদীশচন্দ্রের কাব্য অনুভূতি যেমন তাঁর চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে—ছড়িয়ে আছে নিবন্ধ সংগ্রহে, তেমনি তা সুবিশাল রূপ নিয়েছে তাঁর গবেষণা-চিন্তার পরিপূর্ণ পটভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছেন,

"তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, আমি কি এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি, কি আশ্চর্য নূতন তত্ত্ব একটু একটু করিয়া দেখিতে পাইতেছি, সে সব আমি এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না; সেগুলি দিন দিন পরিস্কাররূপে দেখিতে পাইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন সেই সত্যলাভের জন্য ধ্যান করিতে হইবে।" (৩।১।১৯০১)

রবীন্দ্রনাথের কাছেই তিনি আপন গবেষণার কাব্য মহিমা উন্মোচিত করেছেন। বিজ্ঞান-নিষ্ঠ কবি-সম্রাট তা যথাথই উপলব্ধি করেছিলেন, আর সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আপন উক্তিতেই বিজ্ঞানী মনের সঙ্গে কবিমানসের যোগাযোগের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, ঃ

"কবি এই বিশ্বজগতে তাহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন। শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।" (কবিতা ও বিজ্ঞান ঃ অব্যক্ত)

কবিকর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানীর সাধনার এই ঐক্য ঘোষণার পরেও জগদীশচন্দ্রকে মহৎকবি-রূপে স্বীকৃতি দিতে কে অস্বীকার করবে?

রূপকথা ও অবনীন্দ্রনাথ

অণিমা সেন

প্রথম গল্প ছিল স্বয়ম্ভু, যেন শ্বাশ্বত অনাহত ধ্বনি। পথযাত্রীরা চলার পথে যে পরিচয়ের ইঙ্গিত রেখে যায় এবং তার প্রতিদানে পায় নানারূপ অভিজ্ঞান—এ যেন তাই। সেইরূপ মায়ের ডাকে সাড়া দিয়েছে শিশুরা ও শিশুদের ডাকে মায়েরা।

মায়েরা সন্তানদের গুণ গুণ করে যে ঘুমপাড়ানী গান শুনায় সেইটাই হল আদিগল্প। যে ভাব কথায় প্রকাশ হয় না ঘুমপাড়ানী ছড়াগুলি তারই বাণীরূপ। চিরজাগ্রত চিরবিনিদ্র চিরন্তনী স্নেহ ভালবাসার কাহিনী। কবে কোন দামাল ছেলেকে শান্ত করতে স্নেহময়ী জননী, ঠাকুরমা বা দিদিমারা গুণ গুণ সুর করে ছড়া বলেছিলেন তা সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া কঠিন। সেইরূপ রূপকথারও আদি ইতিহাস নাই। ছড়ার ন্যায় ইহারও জন্ম শিশু-চিত্ত বিনোদনের জন্য। তবে ছেলে ভুলানো ছড়ার সহিত রূপকথার প্রভেদ আছে ছড়ায় প্রকৃত ও অপ্রকৃতের মধ্যে ইহার সীমা রেখা রক্ষিত করা হয় না। ছড়া অসংলগ্ন ও খণ্ডিত ভাবধারা নিয়ে গঠিত। ইহার পরিণতির কোন মাপকাঠি নেই। কিন্তু রূপকথায় অপ্রকৃতকে প্রকৃতের রূপ দান করার চেষ্টাই সর্ব্বদা লক্ষিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ রূপকথা দৈত্য-দানব-রাক্ষস প্রভৃতি সকলকে মানবোচিত মনোভাব দিয়ে পাঠক বা শ্রোতার নিকট প্রকাশ করা হয়।

কোন যুগে মানুষ প্রথম এইরূপে প্রকৃতির সহিত অপ্রকৃতির সম্মেলনে চেষ্টা করেছিল তা স্থির করবার উপায় নেই। কিন্তু দেখা যায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রূপকথায় ইহা প্রচলিত আছে। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে একাধিক দেশের প্রচলিত রূপকথার মধ্যে মূলত একটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। একই গল্প ভারতে, আরবে, পারশ্যে তুর্কিস্থানে বা ইউরোপের নানা দেশে সামান্য সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বহুকাল ধরে শিশুদের মনোরঞ্জন করে আসছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে ঈসপের উপকথা ও আরব্য উপন্যাসজাত রূপকথা শিশু-হৃদয় জয় করেছে। বর্তমান যুগের বিশ্বৎসমাজ গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে রূপকথার উৎপত্তি-স্থল ভারতবর্ষ। 'কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ' প্রভৃতিতে ঐ দুই পুস্তকের বহু-গল্পের সংগ্রহ দেখা যায়। হিতোপদেশ অতি সুপ্রাচীন এবং সুদীর্ঘকাল ধরে লোকপ্রিয়। ইহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পদ্যাকারে রচিত হয়েছিল। ইহার অন্তর্গত কাব্যাংশ (শ্লোকসমূহ) আরও দূরতম শতাব্দীর সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ ইহার বিষয়বস্তু শ্লোকাকারে মহাভারত ও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। প্রফেসার এম্ উইলিয়াম্স তাঁহার বিখ্যাত 'নল' গ্রন্থে (১৮৬০ খৃঃ) মহাভারত ও ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করে বলেছেন যে মহাভারত লিখিত হয়েছিল ৩৫০ খৃঃ পূঃ এবং ঋগ্বেদ ১৩০০ খৃঃ পূঃ।

Sir Edwin Arnold তাঁহার 'The book of good counsels' বলেছেন, হিতোপদেশ, "The father of all Fables" ইহার বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ হতে ঈশপস্ ও পিলপে এবং পরবর্তী যুগে ."Reineke Fuchs" রচিত হয়।

মূল গ্রন্থখানি সংস্কৃতে রচিত; নুসীরাবণের আজ্ঞায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। ক্রমে ফার্সী থেকে ৮৫০ খৃঃ আরবীতে তৎপর হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। তৎকালীন যুগে ভারতে ইহার বহুল প্রচার হয়েছিল। ইহার রচনাশৈলী ও রস মাধুর্যে

মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর স্বীয় মন্ত্রী দ্বারা অনুবাদ করিয়েছিলেন। সম্রাটের আদেশে আবুল ফজল সমসাময়িক ধারায় ইহার সম্পাদনা করেন এবং অপরিজ্ঞাত বিষয় সমূহের টীপ্পনী সংযোগ করেন। অদ্যাবধি ইহা শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে আনন্দ দান করছে।

পূর্বকালে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের অভাবে গল্পের প্রতি লোকের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; কল্পনাকুশল পণ্ডিতেরা নানারূপ গল্প বলে জন-সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করতেন। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা মুসলমানেরা সমধিক গল্প প্রিয়; পূর্বকালে রাজা বাদ্‌শা বা আমীর-বর্গদের সভায় বেতনভুক গল্প-বলিয়ে ছিল। কথকেরা রাত্রিকালে গল্প বল্‌তেন আর শ্রোতারা আলস্য শয্যায় শয়ন করে তা উপভোগ করতেন; শ্রোতার নাসিকাধ্বনি শ্রুত হলেই বক্তা প্রস্তাব কথনে সে রাত্রির জন্য নিবৃত্ত হতেন। পররাত্রে আবার সেই বিরাম স্থান থেকে গল্পের আরম্ভ হতো। তার ব্যতিক্রম হলেই কথকের রচনা-শৈলীর অক্ষমতা প্রকাশ পেত। যিনি পূর্বদিনের কথনের অংশটুকু স্মরণে রেখে পরদিন আবার সেই স্থান হতে গল্পকে পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারতেন তাহারই মুনসীয়ানা প্রতিষ্ঠিত হতো।

আরব্যভাষায় "আলেক লয়লা" নামক গ্রন্থ রূপকথার শীর্ষ স্থানীয়। এই গ্রন্থে কল্পনাদেবীর সুন্দর, স্বচ্ছ ও সাবলীল লীলা পাঠ করে মুগ্ধ হতে হয়। আমাদের মধ্যে ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতির কিম্বদন্তী আছে। সেরূপ দৈত্য, দানব ও ইন্দ্রজালের অলৌকিক শক্তির বিশ্বাস ঐ বইখানিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে লেখকের নাম নাই। বিশেষ প্রণিধান-পূর্বক পাঠ করলে সমগ্র গ্রন্থ একই জনের লেখা বলে মনে হয় না। বোধহয় নানা সময়ে নানা গল্প বলিয়ে গল্পগুলি রচনা করেন। তারপর কেহ নিজ কল্পনা শক্তির প্রয়োগে সেই সব উপকথাগুলি সংকলন করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অবকাশরঞ্জনের নানাবিধ গুণ থাকাতে "আলেকলয়লা" পাশ্চাত্য প্রায় সমস্ত ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। ইংরাজী অনুবাদ থেকে নীলমণি বসাক সর্ব্ব প্রথম (১৮৫০ সন) ইহার বাংলা অনুবাদ করেন।

সাহিত্যের আদি সৃষ্টি রূপকথা। লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার আগে লোকেরা—এই-সব রূপকথায় বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ সবদেশে সবকালে বামন বা ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষের জাতি ছিল। ইতিহাস-অতীত সেইসব জাতির কাহিনীই ক্রমে রূপকথায় পরিণত হয়েছে। একথা মনে রাখা দরকার যে রূপকথার কথকেরা কখনও গল্পগুলি লিখে রাখতেন না; তাহাদের কল্পনা শুধু তাহাদের স্মৃতি শক্তি দ্বারা চালিত হতো। গল্পের ঘটনা সৃষ্টি করতে কল্পনা শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। গল্পের ঘটনা পরিণতি লাভ করে স্মৃতি শক্তির সাহায্যে। এরজন্য কোন মানসিক শ্রমের দরকার হয় না। যদি কেবলমাত্র স্মরণ শক্তির সাহায্যে গল্পের কাঠামোর উপর ঘটনা সংস্থান করা না হতো, তাহলে গল্প-কথকদের মানসিক শ্রম হতো প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রচেষ্টা তৎকালীন যুগের সংস্কৃতিবিহীন লোকদের কাছে আশা করা যায় না। সেই জন্যই বৃদ্ধদের ও শিষ্যদের মুখে যে সব রূপ কথা বা উপকথা শুনা যায় তা মূল গল্পের কাঠামো থেকে অনেক পরিবর্তিত। তার কারণ গল্পগুলিকে সরস ও উপভোগ্য করে তোলার জন্য কথকগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার জাল বুনে গল্পগুলি রচনা করতেন। বাণিজ্যের জন্য মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতো; এবং এক দেশের কাহিনীর সঙ্গে অন্য দেশের কাহিনীর সমন্বয় করে নতুন নতুন গল্পের অবতারণা করতো। গল্প-বলিয়ের বিভিন্ন ঢঙএর উপর গল্পের সাফল্য নির্ভর করতো।

একথা বলা মোটেই অসঙ্গত নয় যে রূপকথার সৃষ্টি হয়েছিল মানব সভ্যতার আদি যুগে। আর সেই যুগে ঐসব রূপকথা শিশুদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। গল্প শুনতে মানুষ

মাত্রই ভাল বাসে সে শিশুই হক আর বৃদ্ধই হক। রামায়ণ, মহাভারত বা রূপকথা প্রভৃতির গল্প থেকে কল্পনাবিলাসী শিশুমন তাদের মনসাশক্তিদ্বারা এতকাল রস গ্রহণ করে এসেছে। বিংশ শতাব্দী শিশু সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ। এই যুগে শিশু-মনোপযোগী বহু সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। কিন্তু শিশুদের মনোরঞ্জক রূপকথার প্রথম অবতারণা করেন 'দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। শিশুমন কল্পনার পক্ষীরাজে আরোহণ করেছে; ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাবার জন্য দেশ দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছে। ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী তাদের দুর্গম পথের সন্ধান দিয়েছে; রূপসী রাজকন্যার মাথার কাছে রূপার কাঠি পায়ের কাছে সোনার কাঠি। ধীরে ধীরে কল্পনায় শিশু-মানস রাজপুত্র রাজকন্যার কপালে ছোঁয়ায় সোনার কাঠি। রাজকন্যা জাগে—রাজপুত্র রাক্ষস-দের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করে রাজকন্যাকে নিয়ে গৃহে ফিরে আসেন। অতি-প্রাকৃতকে প্রাকৃতরূপ দিয়ে দক্ষিণারঞ্জন শিশুদের নিজস্ব জগতের কাব্যলক্ষীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। কল্পনাই রূপকথার প্রাণ। আর শিশুদের কাছে সম্ভব অসম্ভবের কোন পার্থক্য নেই। তাই রূপকথার অবাস্তব বিষয় বস্তু ও প্রকাশ ভঙ্গীর প্রভাবে বাস্তবের প্রাণ পায়; সেই দিক দিয়ে দক্ষিণারঞ্জন সার্থক রূপদার। ঠাকুরদার ঝুলির মালঞ্চ মালা যখন মালিনীকে জিজ্ঞাসা করেন, সে দেশে কোন পাঠশালা আছে কিনা, যেখানে রাজপুত্র চন্দ্র মাণিককে তিনি পাঠাতে পারেন। শুনে মালিনী বলে, "রাজার বাড়ী পণ্ডিত কত পড়ুয়া পড়ায় কুজো আছে, নুজো আছে, গোজো আছে, দুই ঠ্যাং ন্যাংরা আছে, দিনরাত হিলিমিলি, কিলিমিলি, কাকহাটি না বক হাটি।" পাঠশালায় এরূপ সুন্দর পড়ুয়াদের কথা শুনে শিশুর মুখ আনন্দে ঝলমল করতে থাকে।

শিশু-কাব্যলক্ষ্মীর প্রাণ প্রতিষ্ঠায় আরও একজন রূপকারের হাত ছিল। তিনি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। চিত্রকর হিসাবেই তাঁহার প্রথম পরিচয়। যে মন দিয়ে তিনি শিল্পের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করেছেন সে মন দিয়েই অনুভব করলেন শিশুমনের সৌন্দর্য্যকে। তিনি আরও অনু-ভব করলেন শিশু মনের জগত এ জগত হতে পৃথক নয়। তবে ঐ জগতের বিষয় বস্তু চোখে দেখা যায় না উপলব্ধি করতে হয় অন্তর দিয়ে। শিল্পীর দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে বুঝতে পেরে-ছিলেন—কথার সঙ্গে যদি—রূপের যথাযথ সমন্বয় করা যায় তবেই রূপ কথার সৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠে। সেই জন্য অতি প্রাকৃত বিষয়বস্তুর দরকার হয় না। আমাদের ঘরের সাধারণ বিষয়ও রূপকথার চমৎকার ঘটনা হয়।

অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকর; অসম্পূর্ণ জিনিষকে সম্পূর্ণরূপ দেওয়াই তাঁহার কাজ। ছড়া অসংলগ্ন—ছড়া খণ্ডিত ছবি। পাকা চিত্রকরের হাতে সেই অসম্পূর্ণ খণ্ডিত ছবিই পূর্ণরূপ নিয়েছে "ক্ষীরের পুতুলের (১৩০২) ষষ্ঠি তলার চিত্রে।—বানর দেখলে—ষষ্ঠী তলা ছেলের রাজা, সেখানে কেবল ছেলে,—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেই দিকেই ছেলের পাল মেয়ের দল। — — একদল কাঠের ঘোড়া ঠকবক্ হাঁকাচ্ছে, একদল দিঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে - - সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য! সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলা ধূলা, সেখানে পাঠ-শালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই—গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালো জল তার ধারে সর বন, তেপান্তর মাঠ তারপরে আম কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা, টিয়ে পাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন।" কল্পনা ও চিত্রের অপূর্ব সমন্বয়! কথায় চিত্র আঁকার সার্থক সৃষ্টি। সহজ ভাষায় রূপকথার কাব্য-সৌন্দর্য্য অপরূপতায় মনোমুগ্ধকর।

রূপকথার প্রাঙ্গনে মহা মিলন ক্ষেত্র। এখানে না আছে কালের বন্ধন না ভৌগলিকের। সর্ব্বজাতি সর্ব্ব ধর্মের সমন্বয় হয়েছে এই ক্ষেত্রে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমন্বয় হয়েছে বয়সের। সেই দিক দিয়ে রূপকথা প্রকৃত জন-সাহিত্য। সেই জন-সাহিত্যের পুরোধা অবনীন্দ্রনাথ। এখানে তাঁহার আসন শ্রোত্রীবর্গের আসন থেকে উচ্চতেতো নয়ই বরঞ্চ তাহাদের মধ্যে। লেখকের রূপকথার বিষয় বস্তুও একান্ত বাংলা দেশের ঘরের কথা। শিল্পী মনে-প্রাণে ভারতীয়; মনে প্রাণে বাঙ্গালী। তাই বিদেশের কাঠামো হতে ভারতীয় উপাদানে এবং বাংলার রূপসজ্জায় বিষয়বস্তুগুলিকে শিল্প নৈপুণ্যে এমন ভাবে সৃষ্টি করলেন যে তাহাতে রূপকথা রাজ্যের শুধু যে ধন সম্পদ বৃদ্ধি পেল তা নয় তাহার প্রাঙ্গনও দেশ থেকে দেশান্তরে বিস্তৃতি লাভ করলো। লেখকের 'আলোর ফুলকি' 'ভূত পত্‌রীর দেশ' "বুড়ো আংলা" প্রভৃতি বিদেশী গল্পের অনুকরণে; কিন্তু এই সব গল্পের অনুসরণ একান্ত ভারতীয়।

ভূতপত্‌রীর দেশ (১৩২২) চমৎকার রূপকথা! ছড়ার ছন্দ, শিশুদের আবোল তাবোল কল্পনা ও মা দিদিমার মেয়েলি আলাপ প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমন্বয় করে এই গল্পচিত্রগুলিতে অবাস্তব কৌতুক রসের প্রদোষের আলো আঁধারের, প্রাকৃত অপ্রাকৃতের বিচিত্র বর্ণ ছটায় নানা রঙ্‌বেরঙএর আশ্চর্য্য মিশ্রন! আরব্য উপন্যাসের একচ্ছত্র নায়ক খলিফা-হারুণ-আল্‌ রসীদ। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার রঙ্গিন তুলিতে দেখা যায় উড়ে বেহারা হারুন্দেরই ছদ্মবেশেঃ— 'বাগদাদের হারুণ-আল্‌-রসীদের কথা আরব্য উপন্যাসে পড়েছি, আবু হোসেনের থিয়েটারেও দেখেছি;—কখনো সদাগর সেজে বেড়াচ্ছে, কখনো ফকীর, কখনো বা কাফ্রি চাকর। এখন আবার তিনি উড়ে বেহারা সেজে এলেন দেখছি! অবাক হয়ে হারুন্দের মুখপানে চেয়ে আছি—কখন আবার সে ফকীর হয় কি বাদশা হয়। আমাকে হাঁ করে থাকতে দেখে বলছে—

"আমার কথায় বিশ্বাস হল না বুঝি? আচ্ছা দেখো।" বলেই একবার হারুন্দে দাড়িতে গোঁফে মোচড় দিয়েছে। আর অমনি দেখি সে হারুন্দে আর নেই। ইয়া দাড়ি, ইয়া পাগড়ি, পায়ে ঢিলে ইজের আর দিল্লির পারে হাতে বাঁকা এক তলোয়ার নিয়ে দেখা দিয়েছে—হারুণ বাদশা! ফিক্‌কোরে হেসে আমাকে সে যেমন সেলাম করেছে আর অমনি আমি ফস্‌করে দেশলাই জেলে ফেলেছি। বাদশার হাতে গলায় মাথায় হীরে মাণিকের গয়নাগুলো এমন ঝকঝকে করে উঠেছে যে চোখে ধাধা লেগে গেছে। কিচ্‌কিন্দে ছিল পাশে সে অমনি ফুঃ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। আর কোথায় বাদশা?—যে হারুন্দে সেই হারুন্দে! ১

তুলিকায় রূপসৃষ্টি গীতস্পন্দ ভাষা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত কল্পনা যদি রূপকথার প্রধান গুণ হয়ে থাকে তবে অবনীন্দ্রনাথ প্রকৃত রূপকথাকার, কথার তুলিতে রূপকথার অনবদ্য ছবি এঁকে 'অবন পটুয়া' নামের যথাযথ পরিচয় দিয়েছেন।

(১) সুকুমারসেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড পৃঃ ৫২৪)

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঁতে লেগে ঠোঁটটা কেটে যায় মৃগনয়নীর। গালের কস বেয়ে রক্ত পড়তে থাকে। তবু একটা কথা নয়। একটু শব্দ নয়। বনবিহারী গর্জাতে থাকে।—বল বলছি। নইলে খুনই করব আজ। মৃগনয়নী পাষাণের মতই বসে আছে। বড় ছেলে কমল জেগে ওঠে। বাবার চীৎকারে ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। ছোট ছেলে অমল জেগে উঠে কাঁদতে থাকে। নীচু থেকে কমলির মা ওপরে উঠে আসে। ভবানীর মা জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। ডাক্তারের বউ বীণা ভবানীর মাকে ইসারায় জিজ্ঞেস করে ব্যাপার কি! ভবানীর মা ইসারায় বোঝায়—বোধহয় মদ গিলে এসে ঠাণ্ডাচ্ছে। বনবিহারী সামনেই গর্জন করে চলেছে। হঠাৎ গিয়ে মৃগনয়নীর গলাটা চেপে ধরে। মৃগনয়নী উপুড় হয়ে পড়ে যায়। কমলির মা বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে পড়ে। বনবিহারীর দিকে তাকিয়ে বলে। — একবারে মরে যাবে যে! কি কচ্ছেন আপনি? বলে মৃগনয়নীকে সাপ্‌টে নেয় নিজের কোলের কাছে। অন্য স্ত্রীলোক দেখে বনবিহারীর সম্বিত ফিরে আসে। ওদিক থেকে চলে এসে জামাটা গায়ে দেয়। জুতো পরে। হনহন করে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। কমলির মা বনবিহারী যাবার দিকে তাকিয়ে বলে।— অ! মিনসের আবার রাগ! অমন সোয়ামি থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি! ছ্যা, ছ্যা! এমন করে মারে গা! নিজের ইস্তিরি! মৃগনয়নীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে।—কে'দোনি বাছা! অমন কত মার খেইচি! একদিন উল্টে গুঁতো লাগালুম বলেই ত' পাইলে গেল। বলে আবার,—কমলির পর একটা মেয়ে পেটে এল। একদিন পেটে এমনধারা লাথি মারলে, এক্‌বারে বেহুঁস। পেটের ভেতর বাচ্চাটা মরেই গেল। শেষকালে আমার পেরান নিয়ে টানাটানি। তারপর থেকে মারতে এলেই উলটে মারতুম। তবে মারের রোগ গেল! তারপর কিযে হোল!— কমলির গলাটা একটু ধরে আসে। কত বছর আগে কমলির বাবার কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করে। কি একটা যে হয়েছিল। সেটা বড় গোপন। কাউকে বলা যায় না। কাউকে নয়। কমলির মায়ের চোখদুটো একটু জোলো জোলো দেখায়। মৃগনয়নী তেমনি উপুড় হয়েই পড়ে থাকে। ভবানীর মা আসে এবার ঘরে। ডাক্তারের বউ বীণাও।

—কি হোল গা?

—কি আবার! কতায় কতায় বাবুর মেজাজ বিগড়ে গেল, মারতে লাগল। আমি এসে পড়েছিনু তাই রক্ষে। নইলে থানা পুলিশে রমারম লেগে যেত এ্যাতক্ষণে।

বললে কমলির মা।

একটা হাঁই তুলে বলে ভবানীর মা,—আমি আবার একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কিনা?

—কই ঘুমোলে বাছা, দেখনু ত' জানলায় দাঁইড়ে আচো।—বলে কমলির মা।

—ভবানীর মা ধরা পড়ে কথা ঘোরায়,—সেত এই মাত্তর? যাক্‌। বেশী কিছু হয়নি এই ভাল।

আর একটা হাঁই তুলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরোয়। পেছন পেছন বীণা। বীণা একটু অল্প বয়েসী। একটু লাজুক। এদের ভেতর সব চেয়ে সুন্দরী। ও এসেছিল একটু মজা দেখতে। নীরবে চলে গেল। ব্যাপারটা মৃগনয়নীর কাছ থেকেই না হয় পরে শোনা যাবে। আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে কমলির মা? সাধে মৃগনয়নীকে ওঠবার জন্যে। মৃগনয়নী পাশ

ফেরে, শুধু বলে,—একটু ঘুমোব আমি।

—ওমা একি গো! এ যে রক্তারক্তি কান্ড!

কমলির মা আবার বসে পড়ে।

—থাক দিদি।

মৃগনয়নীর গলাটা ভেঙ্গে গেছে। কমলির মা বলে,—তা কখনও হয়!

বলে বাটি করে জল আনে। নিজের আঁচল ভিজিয়ে, ভাল করে মুখ মুছিয়ে দেয়। দেখে ঠোঁট ফেটে গেছে। ওপরের ঠোঁট। মৃগনয়নী চুপ করে শুয়ে থাকে। কমলির মা ওকে এক গেলাস জল খাইয়ে মুখ মুছিয়ে তবে উঠে যায়। রাত তখন অনেক হবে। মৃগনয়নীর চোখে ঘুম নেই। ও ভাবছে কি হোল! বাবার কথাটা মনে হয়।—নিজের দোষ দেখো মা। তবেই সংসারে শান্তি পাবে। দোষ তারও আছে। সে কেন এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কেন এত চঞ্চল হয়ে পড়ল ও এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে। বিভ্রান্ত হয়ে সংসারে লাভ কিছু হয় না। লোকসান হয় প্রচুর। জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। কেন সে ধৈর্য হারিয়েছিল। দোষ তারই। আর নয়। রামতারণের প্রশান্ত মুখখানা দৃঢ় করে মনের ওপর এঁকে নেয়।। ওই প্রশান্ত ওই স্থৈর্য আনতে হবে তার প্রত্যহের আচরণে। তারই জীবনে সহজ হয়ে চলতে দেখা যাবে। সহজ হয়ে চলা বড় কঠিন। সহজ হওয়া সব চেয়ে কঠিন। এ জীবনের এই সাধনাই তাকে এ আঘাতের হয়ত প্রয়োজন ছিল। ভালই হয়েছে। ভালই হয়েছে। বার বার প্রণাম জানায় মৃগনয়নী তার উদ্দেশ্যে যে এত কষ্ট দেয়, যে এত সুখ দেয়। যে এত আঘাত করে। যে এত জ্বালায়। যে সান্ত্বনা দেয়, বুঝিয়ে দেয়। ভেতরে তার আভাসটুকু আজ যেন পরিষ্কার অনুভব করতে পারে মৃগনয়নী। সে আছে। তাই সংসার আছে। তাই জীবন আছে। নইলে জীবনের কোন মানে খুঁজে পাওয়া যেত না। জীবনের এই অর্থটুকুর অন্বেষণ কত যুগ ধরে করতে হয়। কত জন্মের পর জন্ম ধরে করতে হয়। মৃগনয়নী বার বার প্রণাম জানায় তাকে। দুগাল বেয়ে অজস্র চোখের জল পড়তে থাকে ওর।

রাত কেটে গেছে। সে রাত্রে বনবিহারী আসে নি। মৃগনয়নী সকালে ওঠে। শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে বাবাকে। বাবা যেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কি ঠান্ডা করুণ স্পর্শ। হাসছিল একটু একটু। ফিস্ ফিস্ করে বলছিল,— ভয় নেই। কিছু ভয় নেই। ভয় পেয়ো না। ভয়ই পাপ। বাবার সেই হাস্যকরুণ চোখ দুটো। শীতল দীপ্তিতে ভরা। মৃগনয়নী রোমাঞ্চিত হয় বার বার। জীবনে এই প্রথম বাবাকে স্বপ্ন দেখল। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হোল শরীরে মনে যেন একটুও গ্লানি নেই। সব মালিন্য মুছে নিয়ে গেছে বাবা। আর ভয় নেই। সকালে উঠে দৈনন্দিন কাজ সারতে আরম্ভ করে মৃগনয়নী। কমল পড়তে বসে। অমলকে একবাটি মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রাখে। মনে হয় এক একবার, বনবিহারী কাল রাত্রে এলো না কেন? হয়ত কোথাও ছিল। রাগ পড়লেই আসবে। আসতেই হবে। দুশ্চিন্তা হয় না বনবিহারীর জন্যে। ভয় হয়না একটুও। জল তুলে বাসন মেজে ওপরে ওঠে মৃগনয়নী। কমলকে একটা পয়সা দেয় মুড়ি মুড়কি আনতে। সকালের জলখাবার ওদের মুড়ি-মুড়কি। খেতে খেতে পড়তে থাকবে কমল যতক্ষণ না রোদ্দুরটা এসে পড়ে বারান্দা পেরিয়ে চৌকাঠের ওপর। এইটেই ওদের ঘড়ি। চৌকাঠে রোদ্দুর এলেই বুঝবে, এখন স্নান করবার সময় হয়েছে। স্নান করে খেতে যাবে। ততক্ষণে রান্না হয়ে যাবে মৃগনয়নীর। মৃগনয়নী ওদের জলখাবার দিয়ে স্নান করতে নামে। কলতলার কাছে যেতেই কমলির মায়ের সঙ্গে দেখা। হেসে বলে কমলির মা,—কেমন আছো? গা গতরে ব্যাথা নেই ত'?

—না।—সলজ্জ হাসে মৃগনয়নী।

—কত্তা এসেছিল?

—না।

—ওমা সেকি গো? কোথা রইল?

—ভাসুরের ওখানে থাকতে পারে।

বলে কথাটা চাপা দিয়ে কলতলায় ঢোকে মৃগনয়নী। স্নান সেরে রান্না। ওদের খাইয়ে ঘুম পাড়ান। তারপর আবার বাসন মেজে কয়লা ভেঙে নিজে খাওয়া। তারপর কোনদিন ভবানীর মা বা কমলির মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেলা কাত্।

আবার যথারীতি সন্ধ্যে এলো। রাত হোল। এলো না বনবিহারী। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়ল আবার। খোলা বারান্দায় আকাশের নীচে মৃগনয়নী বসে রইল অনেকক্ষণ। দুশ্চিন্তায় নয়। কর্তব্যের তাগিদে। হয়ত আসবে যদি খেয়ে—টলতে টলতে। ধরে না ওঠলে পড়ে যাবে। কেমন একটু মায়া হয় বনবিহারীর জন্যে। মনে হয়, ওর কোন দোষ নেই। সময়ের দোষ। অবস্থার দোষ মনে ওর আর এতটুকু কালিমা নেই। তাই বার বার মনে হয় মানুষের আর কি দোষ।—ঠিক ওমনি অবস্থায় পড়লে সব মানুষই যে ওই রকম হোত না এমন কথা হলপ করে যায় না। সুরেন বাবুর দোষই বা কি। আর ওই মেয়েটার, শোভার? হয়ত মানুষ তারা কেউই খারাপ নয়। বাইরের চোখে মানুষকে সব সময় বিচার করতে যাওয়ার মত মূর্খামী আর নেই। হঠাৎ একসময় চমকে ওঠে। মনে হয় যেন বনবিহারী এসেছে। কাছে দাঁড়িয়েছে। একি! চমকে মৃগনয়নী কি একটা ভাবে বিভোর হয়ে থাকে। রাত অনেক হয়। বসে বসে ঝিমোয় মৃগনয়নী। উঠে চোখদুটো কচলায় মৃগনয়নী। না। কেউ তা নয়। তবে কি মনের ভুল? গাটা ছম্‌ছম্ করে। ওঠে মৃগনয়নী। উঠে দাঁড়ায়। দুবার পায়চারী করে। তারপর আস্তে আস্তে নীচে নামে। সদর দরজার কাছে যায়। সবাই ঘুমোচ্ছে। দরজাটা খোলে। একবার গলিটা দেখে। কেউ নেই। না। ওপাশে কে বসে? ভয়ে একটু পিছিয়ে যায় মৃগনয়নী। বনবিহারী নয়? ভাল করে দেখে মৃগনয়নী। হ্যা। ঠিক বনবিহারীর মতই মনে হয় যেন। আস্তে আস্তে এগোয়। —কে? উত্তরটা আসতে খুব দেরী হয় না।—আমি। বনবিহারী বসে আছে চুপ করে। গলিতে নামে মৃগনয়নী।

—একি! এখানে বসে কেন? চলো।

হাত ধরে বনবিহারীকে ওঠায়। নীরবেই ওঠে বনবিহারী। মদ ত' ও খায়নি। একটুও মদের গন্ধ নেই মুখে। ওকে নিয়ে দোতলায় ওঠে। ঘরে নিয়ে বসায়। কাপড় নিয়ে দেয় বলে,—কাপড় ছাড়ো। ধুলো লেগেছে যে।

—লাগুক।

বনবিহারীর মুখখানা কালো। চোখদুটো যেন অগাধ হতাশায় ডুবে আছে।

—কি হোল তোমার? অমন করছ কেন?

বনবিহারী চুপ করে থাকে।

—আমাকে ডাকোনি কেন?

বনবিহারী একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—তুমি যদি তাড়িয়ে দাও?

—মানে? কি বলছ—তুমি?

ঠিকই বলছি। আমার কি তোমার সামনে আসবার আর মুখ আছে?

—কেন?

—তোমার ওপর এতবড় অন্যায় করবার পরও কি করে তোমার সামনে আসি।

বনবিহারী কোথায় যেন সর্বস্ব খুইয়ে এসে হতাশ হয়ে পড়েছে। প্রতিটি কথায় ওর নিদারুণ দুর্বলতার আভাস পাচ্ছে।

—অন্যায়টা কি করেছ শুনি? নাও কাপড় ছাড়ো।

বনবিহারী বলে,—আমাকে ক্ষমা করেছ বলো।

—ক্ষমা?

—হ্যাঁ। যার জন্যে তোমাকে মেরে গেলাম। সে যে এমন জানোয়ার তাতো জানতাম না।

—কে?—সব যেন ভুলে গেছে মৃগনয়নী।

—শোভা। ওর জন্যেই ত' তোমার ওপর এত বড় অত্যাচারও করেছিলাম। তারপরে ওর কাছেই গিয়েছিলাম। গিয়ে কি দেখলাম জানো?

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে

—গিয়ে দেখি আর একটা লোক এসে তার ঘরে বসে আছে। ডাকলাম, এলো না। চেঁচামেচি করবার পর এসে মুখের ওপর বললে, আপনি চলে যান। আর কখনও আসবেন না।

থামে বনবিহারী। আবার বলে,—অথচ এই কুত্তিটাকে গেল মাসেও চারশ টাকার গয়না দিয়েছি। তোমাকে দেইনি। এই ভালবাসা!

মাথাটা নীচু করে বনবিহারী। মৃগনয়নীর চোখের ওপর ভেসে ওঠে শোভার মুখখানা। ভ্রূ কোঁচকান মুখখানা। কত অনুরোধ করেছিল মৃগনয়নী, তুমি আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও। সত্যিই কি ছেড়ে দিল? কিন্তু তেমন কথা ত' বলে যায় নি। বলে বনবিহারী।—বললাম এই তোমার ভালবাসা! বললে, ভালবাসা কাকে বলে আমরা জানিনা। আপনি চলে যান। বল্লাম তোমার জন্যে আজ নিজের স্ত্রীকে মেরে এসেছি। শুনে কি রকম যে মুখ হয়ে গেল। বললে,—তাঁকে মেরেছেন। তারপরই চোখমুখ লাল করে দরোয়ানকে ডাকলে! দাঁতে দাঁত চেপে বলে বনবিহারী,—হারামী মেয়ে মানুষ! তাড়িয়ে দিলে! চোখদুটো প্রায় সজল হয়ে আসে বনবিহারীর। —আর নয়! আজ বুঝেছি কত বড় ভুল করেছি! মৃগনয়নীর চোখও সজল হয়ে হয়ে আসে। শোভার মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের ওপর। সেই ভ্রূ কুঞ্চিত মুখখানা। কঠিন ওষ্ঠাধর। তবু শোভাকে মনে মনে প্রণাম করে মৃগনয়নী। তার অনুরোধের মর্যাদা দিয়েছে শোভা। কিন্তু মুখের একবারও স্বীকার করেনি। হয়ত জানবেও না।

কথাটা শুধু আমাকেই বলেছিল,—বাইরে থেকে কাউকে বিচার কোর না বাবা! বাইরে থেকে ওই বেশ্যা মেয়েটিকে বিচার করলে কত বড় ভুল করে বসতাম। এ কথাও স্পষ্ট বলেছিল আমায়, জীবনের অনেক মানুষের মিছিলের ভেতর শোভার স্থান সকলের আগে। মৃগনয়নীর শ্রদ্ধার অনেকটা ভাগই পেয়েছিল ওই বেশ্যা মেয়েটি। জিজ্ঞেস করেছিলাম শোভা বেশ্যা হয়েছিল কেন জানেন? বলেছিল একটু হেসে—জানবার কি দরকার বাবা। সব জানতে হয় না। সংসারে সব জানতে যাওয়া বোকামী নয় কি? সব পাতা বাছতে যেও না। গাছের একটা পাতা দেখেই বলে দিতে পারো সেটা আম গাছ কি জাম গাছ। শোভাকে না জেনেছিলাম, তাতে এটুকুও জানা হয়েছিল যে কোন একটা অবধারিত চাপে ওকে বেশ্যা হতে হয়েছিল। আর এইটেই বোধহয় সমাজের সব চেয়ে বড় কলঙ্ক। পরে একদিন দুপুরে শোভা একখানা সাদা শাড়ী পড়ে আমার কাছে এসেছিল, এসে কেঁদেছিল। সেদিন আমার মার খাবার জন্যে ক্ষমা চেয়েছিল। সেদিন ওর গায়ে একখানি গয়নাও ছিল না। এ কথাটা তুমি লিখো না যেন।

অবাক হয়েছিলাম মৃগনয়নীর কথায়।—কেন একথা লিখতে বারণ করছেন। ভাবে বিভোর

হয়ে বলেছিল মৃগনয়নী,—কত মানুষ দেখলাম, কিন্তু জীবনে ওই একটি দিনের মত অত বড় সম্পদ আর পাইনি। তাই ও সম্পদটুকু গোপনেই রেখেছি। আমার স্বামীকেও কোনদিন বলিনি। তাই এই কথাটুকু লিখোনা। তাই হবে। রাজী হয়েছিলাম। পরে আর একদিন দুপুরে শোভা এসেছিল, কি বলেছিল জানি না। কেন কেঁদেছিল জানি না। তাই সে কথা আর লিখতে পারব না। তবু মৃগনয়নীর অটুট শ্রদ্ধাটুকু নজরে পড়েছিল, তাই আমিও শোভাকে মনে মনে আমার শ্রদ্ধা জানালাম। আজ সে বেঁচে নেই। মৃগনয়নীও বেঁচে নেই। আমিই বেঁচে আছি অনন্ত জীবন প্রবাহে মৃগনয়নীর এক বিন্দু জীবনের সাক্ষী হয়ে। যাক সে কথা।

এর পর বনবিহারী আর কখনও শোভার কাছে যায় নি। মাঝে মাঝে বড্ড বেশী মদ খেয়ে ফিরত। এত মদ খেত যে অনেক রাত্রে কাদা মেখে প্রায় গড়াতে গড়াতে বাড়ী আসত। মৃগনয়নী ধরে তুলত। গা মোছাত। শুইয়ে দিত। সবই করত নীরবে। একটা প্রতিবাদও করত না। জানত, এ করে চিরদিন কাটবে না।

কোন একরকম অবস্থাই চিরকাল থাকে না। পরিবর্তন এর হতেই হবে। একটা কথাও বলত না তাই। বনবিহারী যে মদ খাওয়া এত বাড়াচ্ছে তাতেও কিছুই বলত না। অনেকগুলো দিন কাটতে লাগল। অনেকগুলো রাতও দেখতে দেখতে কেটে গেল। এক ভাবেই কাটছে। একদিন দুপুরে ছেলেদের নিয়ে শুয়ে আছে মৃগনয়নী। কমল স্কুলে পড়ছে। ছোটটিকেও ভর্তি করতে হবে সামনের বছর। এই কথাই ভাবছে মৃগনয়নী। খরচ ক্রমশঃ বাড়ছে। রোজগার আগের চেয়ে কমে গেছে। উপরী রোজগার আগের মত আর নেই। তা হোক, টাকার চাপ দিয়ে বনবিহারীকে ও ব্যতিব্যস্ত করতে চায় না। এই টাকাতেই চালাতে হবে। ঝি ছাড়িয়ে দিতে হবে। একটু অল্প ভাড়ায় না হয় একটা ঘর দেখতে হবে। আর কি খরচ কমান যায়! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দরজার আওয়াজ পেয়ে চমকে ওঠে। কালো বৌ এসেছে।

—দিদি! এসো।—উঠে পড়ে মৃগনয়নী। কালো বৌকে কতকাল দেখেনি। কাছাকাছি থেকেও মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল কতকাল। ওরাও যেত না। তারাও আসত না। কালো বৌয়ের একি চেহারা হয়েছে। কালো রঙ আর নেই। ফাঁকাসে হয়ে গেছে। গলার নীচে হাড়টা উঁচু হয়ে আছে। হাতখানা যেন চামড়ায় মোড়া দুখানা হাড়। চোখদুটোর ঠিক নীচে চোয়ালের হাড়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কালো বৌ আস্তে আস্তে এসে ঘরে বসে।

—একি এযে মরতে বসেছ দিদি!

কালো বৌ হাসে। হাসে, না কাঁদে ঠিক বোঝা যায় না।

—এত কালের ভেতর একদিনও ত' এলে না?—মৃগনয়নীই প্রথম জিজ্ঞেস করে।

—আসবার ত' উপায় ছিল না ভাই। আজও লুকিয়ে এসেছি, ওরা সব ঘুমুচ্ছে।

—লুকিয়ে কেন?

—জানতে পারলে নতুনবৌ যে ভাত বন্ধ করে দেবে ভাই।

—ভাত বন্ধ!

কালো বৌ আবার সেই কান্নার মত হাসে। কথা বলে না। মৃগনয়নীও আর কথা বলতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর কালো বৌ বলে—একটা কথা বলতে এসেছিলুম। ওরা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই চলে যাব। মৃগনয়নী চুপ করে থেকে তাকায়।

—আমার ভাইয়ের ঠিকানাটা রেখে যাচ্ছি। তাকে একখানা চিঠি দিয়ে দিবি। তুই ত' একটু লিখতে পারিস, আমি যে মুখ্খু ভাই, লিখতেও জানি না।

—বেশ লিখে দোব। কি লিখব?

—লিখবি।—লিখবি। আর সইতে পারছি না। আর কিছুতেই সইতে পারছি না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে কালো বৌ। মৃগনয়নীর চোখদুটোও সজল হয়ে ওঠে।

—বললে বিশ্বাস করবি না। ভাল করে খেতে দেয় না। সকলের পাতে যে ভাত পড়ে থাকে, সেই ভাত জড় করে খেতে হয় আমায়। তারওপর—।

গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে সরলার। সরলার এমনদশা মৃগনয়নী আন্দাজ করতে পেরেছিল যেন। যখন চলে আসে তখন সরলার কথাই ভেবেছিল। জানত, ওর দুঃখের সীমা থাকবে না। আবার এও জানত, ও সব মুখ বুঁজে সইবে। অসাধারণ সহ্য করবার ক্ষমতা ওর। সেই সহিষ্ণুতার বাঁধও ভেঙে গেছে আজ।

—লিখে দিস। যদি নিতে না আসো, তোমার মেজদি মরে যাবে। ঠিক মরে যাব আমি। চোখের জলে বিশুষ্ক গালদুটো ভেসে যায় ওর। চুপচাপ সময় কাটে। সমস্ত সংসারটা যেন নীরস হয়ে যায় মৃগনয়নীর চোখে।

একটু পরে বলে—লিখে আমি দেব। কিন্তু একটা কথা বলছিলাম।

—কি?

—এখানে এসে থাক না দিনকতক?

—ছাড়বে না যে!

—ছাড়বে না মানে। দেওরের সংসারে দুদিন থাকবে, এতে না ছাড়বার কি আছে।

কালো বৌ বলে,—এসে হয়ত ঝগড়া করবে। বেশ শান্তিতে আছিস, তোর আর অশান্তি বাড়াতে চাই না।

—তুমি থাকলে আমি খুব ভালই থাকব দিদি।

কালো বৌ মুখ নীচু করে চুপ করে থাকে।

—আর নাই গেলে ওখানে। এখানেই থাকো।

ধীরে ধীরে বলে কালো বৌ—তাতে ভাল হবে না। আমি বলছি ভাল হবে না। কালো ভিজে চোখেও হাসে,—তুই অমন জোর করিস নি ভাই, আমি চলি, ঠিকানাটা লিখে নে।

—বলো।—কমলের খাতা বার করে কালো বৌয়ের ভাইয়ের ঠিকানাটা লিখে নেয় মৃগনয়নী। কালো বৌ ওঠে।

—এবারে উঠি। ওরা জাগলে মুস্কিল হবে।

—শোন।—ডাকে মৃগনয়নী।

কালো বৌ ফিরে দাঁড়ায়।

—এরপর কোনদিন আমি গিয়ে যদি নিয়ে আসি? আসবে?

—আসব। কিন্তু তুই যাসনি। প্রমদাঠাকুরুণ খুব খেপে আছে তোর ওপর।

—কি করবে আমার?

—হয়ত অপমান করবে।

—বয়ে গেল। আমি ভাসুর ঠাকুরের কাছে যাবো। তোমাকে নিয়ে আসব। তখন আসব না বোল না যেন। তাহলে কিন্তু বড্ড খারাপ হবে।

—বেশ যাস।

কালো বৌ চলে যায়। যেমন এসেছিল, তেমনি চলে যায়।

মনটা আবার বিষিয়ে ওঠে মৃগনয়নীর। সংসারে কি কোন সুবিচার নেই। কালো

বৌয়ের কষ্টটা যেন ভগবানের এক প্রহসন। তার একটা দৃশ্য হয়ে গেল একটু আগে। তবু মনে হয় আজকের ঘটনা নিয়ে জীবনকে বিচার করা চলবে না। তাতে জীবনের সবটুকু চোখে পড়বে না। আরও সময় রয়েছে। সময়ে আবার কি পরিবর্তন হবে কে জানে। কে বলতে পারে। ভাল করে নিশ্বাস নেয় মৃগনয়নী। আবার শান্ত হবার চেষ্টা করে।

একুশ

এবারে নীরব দর্শকের মত চুপ করে থাকা অভ্যাস করে মৃগনয়নী। প্রতি মুহূর্তের এই অপূর্ব অপরূপ পরিবর্তনগুলো দেখতে ভারী ভাল লাগে। মাঝে মাঝে এখন মনে হয়, কি হাস্যকর। অথচ কি সুন্দর মুহূর্তগুলোর নোতুন নোতুন স্রোত। এতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এক পরম আরামের আস্বাদ পাচ্ছে মৃগনয়নী। কোন কিছুই ওকে আর তেমন করে স্পর্শ করতে পারছে না। বিভ্রান্ত করতে পারছে না।

বড় সহজে আরও অনেকগুলো দিন কাটে। এমন সহজ করে দিনকাটান জীবনে এই প্রথম। খুব ভাল লাগে। খুব ভাল আছে মৃগনয়নী। ঘটনাগুলো যেন আপন নিয়মে ঘটে যায়। তাতে নিজের ভূমিকাটুকু ঠিক রেখে চুপ করে দেখে যাওয়া। এই প্রথম এ শিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে ও।—ও বলত।—এই সময়টাতেই জীবনে সাধনার প্রথম ধাপটা পার হয়েছিলাম। কিছুতেই যেন টলাতে পারছিল না আমায়। সহজ হয়ে হালকা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এ সাধনা ওর জীবনে যে কতটা এগিয়েছিল জানি। কিন্তু সে কথা পরে। এই সময়টাতেই গুরুতর অসুখ হোল বনবিহারীর। অপিস থেকে প্রায়ই অসম্ভব মদ খেয়ে ফিরত। একটু রাতও হোত। সেদিন সকাল সকাল ফিরেছে দেখে মৃগনয়নী একটু চমকে গেল কিন্তু বলল না কিছু।

শিগ্গির বিছানাটা পেতে দাও। দাঁড়াতে পাচ্ছি না। মৃগনয়নী দেখলে, সত্যিই কাঁপছে বনবিহারী। থরথর করে কাঁপছে। উঠে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।

—উঃ! মরে গেলুম। বিছানাটা পাত।

বিছানাটা পাতল মৃগনয়নী। এগিয়ে এসে জুতোটা রেখে দিল এক পাশে। না বলতেই পায়ে জল দিল। পা ধুয়ে জামা পড়েই শুয়ে পড়ল বনবিহারী।

—উঃ! মরে গেলুম!

কি ব্যাপার! নিজেই নিজেই বলে বনবিহারী—ভীষণ জ্বর। মরে গেলুম। কি যন্ত্রণা। উঃ মাগো! ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে মৃগনয়নী। কাছে বসে। বিছানায় শুয়ে এ পাশ ওপাশ করছে বনবিহারী। মৃগনয়নী কপালে হাত রাখে। হাতটা যেন পুড়ে গেল। জ্বরটা খুব বেশী।

—যন্ত্রণা কোথায়?

—পেটে। উঃ!

ছটফট করতে থাকে বনবিহারী। মৃগনয়নী পেটে হাত বুলিয়ে দিতে যায়। চিৎকার করে ওঠে বনবিহারী। পাকা ফোঁড়ার মত বেদনা। কপালে জল-পটি দিতে হয়। পাখা হাতে নিয়ে বসে মৃগনয়নী। ছোট ছেলেটা কোলে এসে বিরক্ত করছে। উঠে গিয়ে ওকে কমলির মায়ের কাছে দিয়ে আসে মৃগনয়নী।—উনি জ্বর নিয়ে অপিস থেকে এসেছেন। ছেলেটাকে একটু দেখবেন দিদি। কমলির মা কোলে নেয় ছেলেটাকে। কোল থেকে নেমে দৌড়োদৌড়ি করে ছেলেটা। করুক। মৃগনয়নী ওপরে এসে বনবিহারীর পাশে বসে। বনবিহারী তাকায়। চোখদুটো লাল

টক্‌টকে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে কখনও। ওর দিকে তাকিয়ে বলে,—আর বাঁচব না। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি—আর বাঁচব না। মৃগনয়নী ওর কপালে গায়ে হাত বুলোয়। বাতাস করে।

—দেখো, এই জ্বরই শেষ জ্বর।

ছেলেমানুষের মত কথা বলে বনবিহারী। একটুও বিচলিত হয় না ও। শুধু বলে,—জল খাও ত' একটু। বনবিহারী জল খায়। মৃগনয়নী কমলকে বলে,— শোন, এই সামনের বাড়ীর ডাক্তারের বৌকে একবার ডেকে দে ত' বলবি, বাবার অসুখ করেছে। মা একবার ডাকছে।

কমল বারান্দার কোণে বসে বোর্ড কেটে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে একটা কাগজের বাড়ী বানাবার চেষ্টা করছিল। মায়ের কথা শুনে উঠে পড়ে। ডাক্তারের বৌ বীণাকে ডাকতে যায়। মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে যায় মৃগনয়নীর। চোখের দৃষ্টিটা আরও শীতল স্থির মনে হয়। যেখানে মন এমনিতেই বিভ্রান্ত হবার কথা। সেই খানেই ও যেন মনকে টান-টান করে রাখতে পারছে। ভারি অবাক লাগে পরে ভাবতে গেলে। বনবিহারী পাশে একভাবেই বসে থাকে। বনবিহারীও তেমনি ছট্‌ফট্ করে চলেছে। কিছু কিছু অসংলগ্ন কথাও বলছে। এটা বনবিহারীর স্বভাব। একটু জ্বর-জ্বারি হলেই ও যেন বড় বেশী ছট্‌ফট্ করতে সুরু করে। ঠিক বিকার না হলেও বাজে বকতে থাকে। ওগুলো চুপ করেই শুনে যেতে হয়। শুনে ঘাবড়ালে চলবে না। পাখাখানা সমানে চলছিল। বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল তবু ঠিক একই ভাবে পাখা চলছে। মৃগনয়নী পারে। কমল ফিরে আসে।

—কি হোল রে?

—মাসীমা আসছেন।

একটু পরেই ডাক্তারের বউ বীণা আসে।

—কি হোল দিদি?

মৃগনয়নী সব বলে।

—আচ্ছা উনি এলেই আমি পাঠিয়ে দোব।

—ওঁকে বোল ভাই এখন কিন্তু টাকা বেশী দিতে পারব না।

—এখন দেবার দরকার নেই। এক পাড়ার মানুষ! এটুকুও যদি—।

বীণা হাসে

মৃগনয়নী বলে,— এলেই কিন্তু পাঠিয়ে দেবেন। বড্ড চিৎকার করছে।

—ওতে ভয় পাবেন না। এলেই পাঠিয়ে দোব।

বীণা চলে যেতে চায়।

মৃগনয়নী ওর ব্যবহারে একটু সাহস পেয়ে বলে,—ভরসা দেন ত' একটা কথা বলি।

—বলুন।

—যদি দরকার হয়, শুধু চিকিৎসা নয়। হয়ত কিছু টাকাও আমায় দিতে হবে।

বীণার মুখখানা শুকিয়ে যায়।

—টাকা ত' ভাই আমার কাছে থাকে না। ওঁকে বরং বলে দেখতে পারি।

—না। আপনাকেই দিতে হবে। অবশ্য আমার গয়না রেখে টাকা দেবেন।

—গয়না!

—হাঁ। গয়না রেখে দিতে পারবেন না?

ক্রমশঃ

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

স্যারা

এক শুক্রবারে আতলিয়েতে পৌঁছতে জিওভানেল্লি আমায় দেখেই রোসিনির বারবার্ অফ্ সেভিল্-এর এক আরিয়া ভাঁজতে শুরু করেছিলেন। বল্লাম প্রফেসার-এর আজ দেখছি যে ভারি মেজাজ খুস্। তিনি গান থামিয়ে খুব ভাল ভাবে হাত সাফ করার ভনিতা করে পকেট থেকে বের করলেন একটি ভিসিটিং কার্ড। সেটিকে অতি সন্তর্পনে দু' আঙুলে ধরে নাকের কাছে নিয়ে একটা আঘ্রানের লম্বা টান দিলেন যেন কত আতরের সুগন্ধ কার্ড থেকে বেরিয়ে তাঁর নানারন্ধ্রে সুবাসের সুখানুভূতিতে ভরে দিল। এত অভিনয়ের কারণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল যে মিস্ হিটন তাঁর কার্ডের পিছনে পরের দিন আমাকে তাঁর আতলিয়েতে চায়ে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

রুদে ক্লাঁত রাস্তার দুধারে অনেকগুলি ইমারত যেগুলিতে কেবল শিল্পীদের জন্য তৈরী আতলিয়ে ফ্ল্যাট ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। সংগতিসম্পন্ন শিল্পী বা শিল্পীর পেশার ভাগ্যকারি ধনীদের আবাস এগুলি। প্রত্যেকটি ফ্ল্যাট-এ একটি ছাদ উঁচু আতলিয়ে কামরা যার বাইরে মুখকরা দেওয়ালে আছে বারো কি চোদ্দ ফুট লম্বা-চাওড়া কাচের জানলা। এরই মাঝখানে আবার ফ্রেঞ্চ উইন্‌ডো যার সামনে ঝোলা বারান্ডায় গেলে প্লেম গাছে ভরা রাস্তার মনোরম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় নক্সাদার লেস্-এর মত জালি পর্দ্দায় ঢাকা জানলা দিয়ে জৌলুষ নিঙড়ে ফেলা দিনের আলো ঘোলা হয়ে ভিতরে আসে কিন্তু বাইরে থেকে অন্দরের কিছু দেখতে পাওয়া যায় না অথচ কামরার ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্য বেশ পরিস্কার দেখা চলে। রাত্রে আলো জ্বাললে দিনের বেলায় ঢাকা আব্রু জালি পর্দ্দায় আর রক্ষা হয় না বলে ভারি ভেলভেটের মোটা পর্দ্দা টেনে দেবার ব্যবস্থা আছে। জানলার উল্টো দিকের দেওয়ালের এক পাশ দিয়ে গেছে সিঁড়ি, ছাদ আর মেঝের মাঝ বরাবর খানিকটা ঢাকা ছাদের উপর গ্যালারি পর্যন্ত। এই গ্যালারির একটা অংশে বাথরুম ও রান্নার ঘর এবং অপরদিকে শোবার ঘর, আর মাঝখানের অংশে বসবার ঘরের কাজ সারা যায়।

ধনীনন্দিনী মিস্ হিটন-এর আতলিয়েতে পৌঁছে দেখি চায়ের রীতিমত আয়োজন হয়েছে। কাচে ঢাকা গোল টেবিলের উপর ফরাসী পেস্ট্রি ও মিঠাই ভরা প্লেটগুলি ফুলের তোড়ার মত শোভা পাচ্ছিল। তাঁর অতিথিদের মধ্যে আমি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন হিটলার-পীড়িত প্রাচ্য ইউরোপীয় একদেশের ডাঃ লিটনা ও তাঁর ইংরাজ স্ত্রী, মাদাম মিউভিল এবং এক চৈনিক অধ্যাপক। ফ্যাসিস্ট- বিরোধী ডাঃ লিট্‌না দেশত্যাগী এবং তাঁর কথার বিষয়বস্তুতে সর্বদা পলিটিক্‌স্-এর ঝাঁজ ঘুরে ফিরে আসছিল। চীনা অধ্যাপক নির্বিকার শ্রোতা হয়ে তাঁর সদা প্রসন্নমুখে মাঝে মাঝে হাসির চিড় খাইয়ে দেখাচ্ছিলেন যে তিনি আমাদের সব কথা মন দিয়ে শুনছেন কিন্তু তিনি যাবার আগে বিদায় সম্ভাষণ ছাড়া আর একবারও কথা বলেননি। ডাঃ লিটনা প্রশ্ন করলেন "তোমরা কি সত্যি বিশ্বাস কর যে গান্ধীর অহিংস পন্থায় তোমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে?" বল্লাম "বিশ্বাস না করলে এত শত সহস্র ভারতবাসী তাঁর কথামত আন্দোলন করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ ও উৎপীড়ন সহ্য করছে কেন?" তিনি শুনে একটি বিদ্রু-

পের হাসি হেসে বল্লেন "অহিংস আন্দোলনে ইংরেজের বিরাট সামরিক শক্তিকে প্রতিহত করবার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। তোমরা যদি স্বাধীনতা সীতা পেতে চাও তা হলে হয় ইংরাজ-বিরোধী অন্য সামরিক শক্তিময় জাতির সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান করে ওদের হটাবার ব্যবস্থা করা উচিত অথবা গোপনে হালকা অথচ ফলদায়ক এমন আধুনিক আয়ুধ অন্যদেশ থেকে সরবরাহ করে দেশের লোককে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী করে ব্যাপক অভিযানের আয়োজন করতে হবে।" উত্তর দিলাম "মহাশয় আপনার দেশের হিটলার-এর পদলেহী ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে এই পন্থায় হটাবার ব্যবস্থা করেছেন বুঝি? কিন্তু ফ্যাসিসম তো কেবল অস্ত্রবলে বলীয়ান একটা সামরিক শক্তি নয় এটা তার উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবার একটা অঙ্গ মাত্র। ফ্যাসিসম-এর অভিব্যক্তি হয়েছে একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারায় যার অবলম্বনে ও বিশ্বাসে জন্মেছে এই শক্তি। ভারতবাসীর স্বাধীনতার ঐকান্তিক ধারনা থেকে যে শক্তি জন্মগ্রহণ করবে তাকে কামান বন্দুক দিয়ে প্রতিহত করা যাবে না। জানেননি গান্ধীজিকে একবার গ্রেপ্তার করলে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা শরীরকে কারারুদ্ধ করছো কিন্তু আমার দেশস্বাধীনতার চিন্তাকে তোমরা কোনদিন বন্দী করতে সক্ষম হবে না।' যখন ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রথম বিরাট রোমক সামরিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছিল একমাত্র ধর্ম্মে গভীর বিশ্বাস ছাড়া তাদের আর কোন অস্ত্র ছিলনা। সে সময়ে আমার মত অনেকে নিশ্চয়ই ঐ পাশবিক শক্তিকে অজেয় মনে করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে তার প্রকোপে ক্রিশ্চিয়ানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।। দাসত্বের মুক্তিকামী স্পার্টাকাস রোমক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে যদি অহিংস পন্থায় বিরোধিতা করতো তা হলে তার আত্মত্যাগে যে শক্তির সঞ্চার হোত তাকে সহজে রুদ্ধ ও বিনষ্ট করবার মত সামর্থ তদানিন্তন রোমক সামরিক বলে বজায় থাকত কিনা সন্দেহ।" তিনি বল্লেন "হিংসা বা অহিংসা যে-পন্থাই হোক রোমক শক্তির বিরুদ্ধাচরণে স্পার্টাকাস এবং তার অনুচরবর্গ একবার কেন দশবার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাত।" বল্লাম না মহাশয় ফল কিছুটা তফাৎ হোত। অহিংসভাবে আন্দোলন করে স্পার্টাকাস বিফল হলে ইতিহাস তাকে আজ বলত মার্টার্ এবং যুগযুগ ধরে সে মানবধর্ম্মে বিশ্বাসীদের কাছে পেত সম্মান ও সহানুভূতি। কিন্তু জিঘাংসার পথ নিয়ে মুক্তিকামী স্পার্টাকাসের মৃত্যু ইতিহাসের পাতায় একটা সামান্য বিদ্রোহ-দলন মাত্র।" লিটনাপত্নী অন্য মন্তব্য করে আমাদের তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁর মতে আমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ জাত। "ইংরাজ অসভ্য ও অনুন্নত ভারতবাসীদের উপকারার্থে শহর, রাজপথ, সেতু, রেলপথ বড় বড় ইমারত ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেছে এবং আমাদের সভ্য করার চেষ্টা করছে। আমরা তাদের অনুগত থেকে এই উপকারের সুযোগ না নিয়ে অকৃতজ্ঞতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে আন্দোলন করছি এবং এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হ'তে পারে। আমাদের না আছে আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার সৎসাহস, সামর্থ ও আসয়। রক্ষক ইংরাজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলে নৃশংস কমুনিষ্ট রাশিয়ানরা এদেশ অধিকার করে ভারতবাসীকে তাদের দাস বানিয়ে উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেবে। আমরা সে কথা একবার ভাবলে এমন মতিচ্ছন্ন হতাম না।" মাদাম লিটনকে এর সঠিক জবাব দিলে জানতাম যে সেখানে বসে চা খাওয়া আর সম্ভব হোত না এবং মিস হিটনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। দুঃখের বিষয় যে, এই ভ্রান্ত ধারণা কেবল লিটনা পত্নীর একার নয় আজও সারা ব্রিটেনে লক্ষ লক্ষ লোকে এই একই ভাবে চিন্তা করে এবং ভারত সম্বন্ধে অবিচার করে। দুই শতাব্দীর রাষ্ট্রিয় সান্নিধ্য সত্ত্বেও ব্রিটেন আপনার সাম্রাজ্য শাসন পদ্ধতির সাফাই গাইবার একটা কপট অভিমতকে আপন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অভিসন্ধিতে

ভারতীয় জন ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে কত মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে এবং সেই ভুল ধারণা ব্রিটিশ জনগণের মনে এখনও বদ্ধমূল হয়ে আছে। নিজেকে সংযত না করতে পেরে বল্লাম "মাদাম কেবল কিংবদন্তির উপর বিশ্বাস করে আমাদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে এতগুলি কটূক্তি না করে যদি সত্য জানতে ইতিহাসে একটু চোখ ফেলে দেখতেন তা হলে আপনার উপলব্ধি হোত যে আমাদের উপকারার্থে ব্রিটিশ সরকার রাজপথ, রেলপথ, সেতু, ইমারত ইত্যাদির কোনটাই তৈরী করেননি। এগুলি করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অনায়াসলভ্য মোটা রেভিনিউর লোলুপতায় নামমাত্র পারিশ্রমিকজীবি সস্তার জনমজুরদের খনি ও কারখানায় প্রেরণের সুবিধার জন্য ও প্রায় পড়ে পাওয়া কাঁচামাল ভারত থেকে রপ্তানি করে সহজে পয়সা বানাবার চেষ্টায়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউসান্ করে ব্রিটেন আজ শক্তিমান ও অর্থশালী কিন্তু সেই ইনডাস্ট্রিয়াল রেভলিউসান্‌কে সফল করতে যে সোনা দানার প্রয়োজন হয়েছিল তার বেশীর ভাগই চান করা হয়েছিল এই অভাগা দেশ থেকে। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমলে প্রত্যেকটি ষ্টারলিংএর চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ এসেছিল ভারতের ধনভাণ্ডার শোষণ করে। আমাদের দেশের অশিক্ষিতের সংখ্যাধিক্য জ্ঞাপন করতে আপনার বিস্ময়ে উপরে উঠা ভুরু মাথার চুলের কিনারায় ঠেকে থাকা খেতে চায় কিন্তু আমাদের দেশের ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষাকল্পে যে ব্যয় বরাদ্দ করেছে তা শুনলে আপনার বিবেকে যদি বিশ্বাস থাকে তো আড়ষ্ট হয়ে ও ভুরু আর নীচে নামতে চাইবে না। সারা বছরের শিক্ষাকল্পে প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য ব্রিটিশ-সরকার গড়ে দুই পেণীর মত অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত। বড়ই দুঃখের কথা যে সরকার থেকে এত বড় দান পেয়েও আজ ভারতে শতকরা তিরেনব্বই জন নিরক্ষর। আর ব্রিটিশ-ন্যায্য-বিচারের কথা বলছেন—ওয়ারেন হেষ্টিংসএর আমলে ভারতবাসী কলিকাতা শহরে ব্যবসা করতে চাইলে তাদের মাশুল দিতে হোত কিন্তু ইউরোপীয় হলে বিনা মাশুলে তাদের ব্যবসা করার অধিকার ছিল। হেষ্টিংস যখন বলেছিলেন এ অন্যায় প্রথা এবং এটা বন্ধ হওয়া উচিত, তখন তাঁকে অসাধু বলে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আলাদতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছিল। তাঁর সারা জীবনব্যাপী এই মামলায় যখন তাঁকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করে নিষ্পত্তি করা হল সুনামহানি ও অর্থহানির জন্য হেষ্টিংসকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছুই দেওয়া হয়নি।" মিস্ হিটন্ বলে উঠলেন "অনুরোধ করছি মাশিয় আর আমাদের হেয় করো না যদি এমনি করে আমাদের কলঙ্কের ফিরিস্তি দিতে থাক তা হলে আমার আতলিয়ের সাদা দেওয়াল কাল হয়ে যাবে।" তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে হঠাৎ এতগুলি অপ্রিয় সত্য কথা বলে ফেলার জন্যে তাঁর কাছে মাপ চাইলাম। ডাঃ লিটনা বল্লেন "যে অবিচারের ও অন্যায় পরধন-শোষণের কথা বল্লে সেটা টিউটন্ জাতির একটা মজ্জাগত দোষ। তারা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই দেখিয়েছে আসুরিক শক্তির দম্ভ ও দুর্ব্বলের পীড়ন। এই জাতের চরম প্রতীক হচ্ছে হিটলার।" উপস্থিত ৩জন ইংরাজ মহিলা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন "আমাদের জাতকে যতখুসী গালাগালি দাও কিন্তু ঐ পাষণ্ডের সঙ্গে বা তার স্বজাতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কতুলে অপমান করো না।"

সমষ্টিগতভাবে কোন জাতির স্বভাবধর্ম্ম নৃশংস ও হীন বলে দোষারোপ করা অন্যায় হবে কিন্তু হিটলার ইহুদীপীড়নে নির্ম্মম অত্যাচার ও হত্যা প্রণালীর অভিনবত্বে সারা জগতে যে মর্ম্মান্তিক গ্লানির সৃষ্টি করেছে তার কালিমাকে মুছে ফেলতে সারা জার্ম্মান জাতিকে বহুযুগ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মধ্য যুগে যে কারণে ইহুদী পীড়ন হয়েছিল বর্তমানের বিদ্বেষ তাকে উপলক্ষ করে নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ায় স্বার্থাভিসন্ধি দু'একটি রাষ্ট্রীয় দল রাজনৈতিক মন্দ পরিস্থিতির জন্য ইহুদীদের মিথ্যা দায়ী করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। প্রিন্স বিসমার্ক, প্রিন্স লেইস্‌তেন্‌স্তাইন্‌, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির রক্ষণশীল দল, তৎকালীন রুমানীয় সরকার, চার্চ্চের পক্ষাবলম্বীরা এমনকি পোপ পর্যন্ত ইহুদীদের সকল পাপবহনকারী ছাগের পর্যায়ে ফেলে নিজেদের স্বার্থাভিসন্ধি পূরণের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ইহুদীরা ইষ্টার ব্রতের জন্য তৈরী রুটীতে মানুষের রক্ত মিশায় এই মিথ্যা অপবাদ প্রচারে রাশিয়া ও পোলাণ্ডএ তাদের লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধের নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড ও সহস্র সহস্র ইহুদী রমণীর পাশবিক ধর্ষণ অত্যাচার ও পরিশেষে প্রাণনাশের পিছনে ছিল রাষ্ট্রনৈতিক দুরভিসন্ধি। ফ্রান্সে ঘৃণ্য দ্রাইফুস্‌ কেসএর উৎস ছিল ঐ একই কারণ। সারা ইউরোপে প্রায় দুই শতাব্দীতে জমা ইহুদী পীড়নের নোংরামী রূপ ধরেছে জার্ম্মান ফুরের হিটলারএর প্রতিষ্ঠায়। যে লক্ষ কোটি ইহুদী তার কবলে পড়ে পাশবিক নির্যাতন ও পরিশেষে হত্যার বিবিধ ও অভিনব পন্থায় নিহত হয়েছিল তাদেরই একজন ছিল স্যারা। সে ছিল জাতে পোল ও ইহুদী। আর্যরক্ত ও সভ্যতা শুদ্ধিকরণের দাবানলকে এড়িয়ে পারীতে এসে সে ভেবেছিল এবার পরিত্রাণের সীমানায় পৌঁছে আরম্ভ করবে নতুন জীবন। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেল এক বন্ধুর ডেরায়। সে খুঁজছিল তাকে বিনা পারিশ্রমিকে ইংরাজী শেখাতে রাজী এমন কাউকে। বন্ধু প্রস্তাব করলেন যে আমরা দু'জন ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শেখায় বিনিময় করি তাকে কেউ পারিশ্রমিক দিচ্ছে না এই দ্বিধা মনে আসার কোন কারণ থাকবে না। পরিচয় একটু পুরানো হলে স্যারার অনুরোধে তাকে ভারতীয় প্রথায় আঁকা আমার কয়েকখানি ছবি দেখিয়েছিলাম। তারপর আবার সেদিন আমরা ভাষাশিক্ষার ক্লাস করতে বসলাম সে একটু ইতস্ততঃ করে বল্ল "তোমার ঐ ছবিগুলি আমার মনকে বেশ রীতিমত আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে আপন দেশ বিতারিতা আমি দরিদ্রা রেফুজি। আমার এমন সঙ্গতি নেই যে মূল্য দিয়ে তোমার রচনার একটি কিনতে পারি। কিন্তু এর একটি পাওয়ার আর কোন উপায় ভেবে ভেবে যে আকাশ কুসুমকে চোখের সামনে খাড়া করেছি সেটা তোমাকে বলে ফেলে অন্তত মনকে হাল্কা করে ফেলতে চাই। তোমার ছবির দাম নিশ্চয়ই অনেক এবং আমার সাধ্যাতীত কাজেই মূল্য জিজ্ঞাসা করার ধৃষ্টতা ছেড়ে তোমায় আমি অনুরোধ করছি যে আমাকে তোমার কোন কাজ করতে দাও এবং যতদিন না সেই কাজের পারিশ্রমিক তোমার ছবির দামের সমান না হয় ততদিন খাটতে প্রস্তুত আছি।" বল্লাম "মাদময়সেল্‌ আমি এক গরীব শিল্পশিক্ষার্থী কি কাজ তোমায় দিতে পারি যার জন্যে পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে।" সে বল্ল "তোমরা তো শিল্পানুশীলনে মডেল নিযুক্ত কর আমি তোমার মডেলের কাজ করতে প্রস্তুত। অবশ্য বস্ত্রহীনা হয়ে জীবনে অপরের সামনে দাঁড়াইনি আজ সে লজ্জাকে ভাঙ্গবার মত সাহসকে আনতে পারব কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।" তার প্রস্তাবে হতবাক আমি কি জবাব দেব ভাবছি দেখে ভুলবুঝে সে বল্ল "ও কি আমার বোকামী! আমার শরীরের গঠন তোমার শিল্পাদর্শের উপযোগী কিনা না দেখে কেমন করে তুমি স্বীকার পাবে যে আমি মডেলের পারিশ্রমিক অর্জনের যোগ্যা। যদি রাজী হও তো আমি চেষ্টা করব আমার শরীরের গঠনকে তোমার সামনে দেখাতে এবং যদি দেখ যে কাজের অযোগ্যা আমি তা হলে যে প্রস্তাব করেছি তা ভুলে যেও। আমি মনকে বোঝাব যে আমার মত দীনার শিল্পরত্নসংগ্রহের লোভ সংবরণ করা উচিত।" "এ বিষয়ে পরে কথা হবে" বলে পরের ভাষাচর্চ্চার ধার্য দিনে আমার ছবিগুলির

একটি এনে তাকে উপহার দিলাম। সে জিজ্ঞাসা করল কবে থেকে তাকে মডেলের কাজ আরম্ভ করতে হবে। তাকে আমার মডেল হ'তে হবে না বলায়, ভীষণ আপত্তি করে স্যারা বল্ল "বিনা মূল্যে আমি কোন স্পর্ধায় এ ছবি নিতে পারি। অন্তত তুমি যতদিন পারীতে আছ আমায় তোমার ময়লা জামা কাপড় কেচে সাফ করতে দাও এবং ছিঁড়ে যাওয়া মোজাগুলি আমায় রিপু করতে দেবে। এটা ঋণশোধের চেষ্টা বলে মনে করি না কিন্তু তার একটা ভাণ করা তৃপ্তির প্রচেষ্টা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।" বল্লাম এ সামান্য ছবির দাম দেওয়ার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন। এর বাস্তব মূল্য তো কেবল পঞ্চাশ সান্তিম্‌এর (পুরানো ছ'পয়সার সমান) একখানা কাগজ আর সামান্য কয়েক ফ্র্যাঙ্কের রঙ। কিন্তু মনের জগত থেকে আহরণ করে যে রূপকে এই কাগজখানার উপর রাঙানো হয়েছে তার সঠিক মূল্য দিতে পারে এমন মুদ্রা আজও তৈরী হয়নি। ক্রেতা আপনার মন ঠকায় শিল্পীকে তার পারিশ্রমিকের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তাকে কৃতার্থ করেছে ভেবে আর শিল্পী সে মূল্য পেয়ে ভাবে এ হল তার দৈনন্দিন তৈল ইন্ধনের সমস্যার সাময়িক সমাধান এবং এর ফলে উদরান্ন সংস্থানের দুশ্চিন্তার থেকে কিছুকাল অব্যাহতি পেয়ে সে মনের জগতে রূপের খোঁজে বেপরোয়া ঘুরতে পারবে। কাজেই এ ছবির পয়সার দাম নেই মাদময়সেল। শিল্পী তার মনের গহনে চিন্তার বনপ্রান্তরে চলতে কোন অভিনবের সাড়া পেয়ে আনন্দে বা বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যায় এবং তারিই একটা রূপক ভেবে নিয়ে ছকে, রঙে বা গঠনে ফেলে চায় আবার সেই অনুভূতির উচ্ছ্বাসকে বারে বারে নতুন করে উপলব্ধি করতে। তারপর সে চায় সেই উপলব্ধিকে অপর অনেকের মনে জাগিয়ে তার সৃষ্টির আনন্দের ভাগ দিতে। তাই সে শিল্প সৃজন করেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না দেখাতে চায় তার সৃষ্টিকে জগতজনকে। তার শিল্প সার্থক হয় যখন আর কেউ শিল্পীর অনুভূতির অংশীদারি হয়ে এই নবসৃষ্টির তোরণ পেরিয়ে চলতে থাকে তার কল্পরাজ্যের রাজপথে, হাটে বা বাগানে এবং তখনি সে দর্শক দিয়ে ফেলে শিল্পের প্রকৃত মূল্য। মাদময়সেল তুমি বোধহয় না জেনে দিয়ে ফেলেছ এ ছবির মূল্য একে পাবার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়ে।

স্যারা স্বপ্ন দেখত তার প্রেমেমুগ্ধ ছেলেবন্ধু একদিন হবে তার ফিয়াঁসে এবং তারপর সংসারে ভার নেবার মত অর্থাগম হলে তারা বিবাহ করে বাঁধবে ঘর। তাদের দাম্পত্য নীড়ে সুখদর্শনের স্মারকের একটি হবে এই ছবিখানি। তার বন্ধুকে স্যারা প্রায় দশবার সবিস্তারে জানিয়েছিল কেমন করে সে আমার কাছ থেকে ছবিখানি আদায় করেছে।

যুদ্ধান্তে পারীতে ফিরে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের খোঁজে পেলাম স্যারার খবর। হিটলারীয় ইহুদীবিনাশী অনুসন্ধানীদের কবলে পড়ে তার সুখস্বপ্নের শেষ হয়ে যায় গ্যাস চেম্বারে। ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বেলাভূমিতে স্যারা একটি বালুকণা মাত্র যার সর্ব অস্তিত্ব হতসর্বস্বের রাশিতে লুপ্ত হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রমনস্কতা, রাজনীতি ও অতি-রাজনৈতিকতা

আশ্বিনের "সমকালীনে" আমার লেখা 'বুদ্ধিজীবি ও রাষ্ট্রমনস্কতা' পড়ে শ্রীসোমেন বসু প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছেন। (সমকালীন, কার্তিক ১৩৬৫)।

প্রথমেই সোমেন বাবুকে জানিয়ে রাখি যে আমার লেখা প্রবন্ধটির নাম "বুদ্ধিজীবি ও রাষ্ট্রমনস্কতা", 'রাজনৈতিকতার বিপক্ষে' নয়।। তিনি আরও অবধান করলে বাধিত হব যে মূলতঃ সৃজনীশিল্পী বা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের যে প্রবণতা সম্বন্ধে আমি শঙ্কা প্রকাশ করেছি, তা হচ্ছে তাদের নিজ কার্য্য সম্পূর্ণ বা বহুলাংশে ত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় দপ্তরে কর্ম্মনির্বাহকের দায়িত্ব গ্রহণ, কিম্বা সংসদ বা বিধানমণ্ডলীর সভ্য হবার আগ্রহ। 'রাজনীতি' বলতে সোমেন বাবু যা মনে করেন অর্থাৎ রাষ্ট্র সম্বন্ধে চিন্তায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, তাঁর বিরুদ্ধে আমি কোথায় আপত্তি তুলেছি তা' তিনি দেখালে ভাল করতেন। 'সক্রিয় রাজনীতিতে' আমি উল্লিখিত শ্রেণীর—বুদ্ধিজীবিদের অংশগ্রহণ অবশ্যই দুঃখজনক মনে করি—কিন্তু রাষ্ট্রসম্বন্ধে চিন্তা করা বা সমাজজীবনের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রকর্ম্মগ্রহণের কিছু তফাৎ আছে বলেই, আমি পৌনঃপুনিকতা দোষ সত্ত্বেও আমার আশঙ্কা ব্যক্ত করতে গিয়ে উল্লিখিত বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে রাজনৈতিক দল, বিধানমণ্ডল বা প্রশাসনিক অধ্যক্ষ হিসেবে সচিবালয়ে যোগদান এবং সেই ভাবে রাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ, আইন-প্রণয়ন বা প্রশাসনে অংশগ্রহণ অবাঞ্ছনীয় বলে উল্লেখ করেছি। এর কারণস্বরূপে আশ্বিনসংখ্যার প্রবন্ধটিতে বলেছিলাম যে ভারতবর্ষের মত দেশে উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞের দুর্ভিক্ষ বিদ্যমান থাকতে, সমাজের সর্বক্ষেত্রের কুশলী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই যদি নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে আংশিক বা সামগ্রিকভাবে পরিত্যাগ করে সক্রিয় রাজনীতিতে বা রাষ্ট্রকর্মে মনোযোগী হয়ে ওঠেন, তবে তা' দেশের পক্ষে অশুভ। এতে সোমেন বাবুর উদ্ভাবনী প্রতিভা অবশ্য লেখকের মানসিক জড়ত্ব ও নব-বর্ণাশ্রমের প্রতি তার আসক্তি আবিষ্কার করতে পারেন, তবে সমাজবিজ্ঞানের বিনীত ছাত্রমাত্রেই লেখকের চিন্তাধারায় যে সূত্রটির সন্ধান পাবেন, তাকেই বলা হয় Specialisation বা বিশেষায়ণ। সমাজবিজ্ঞানের কোন শাখা সম্বন্ধেই অবশ্য আমি পাণ্ডিত্যের দাবী করি না বা কাউকে সমাজতত্ত্বের অ-আ-ক-খ শেখাবার দুঃসাহসও আমার নেই, তবে আরও দশজনের মত এটুকু আমি জানি যে বিশেষায়ণ শুধু সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম সহায়ক-ই নয়, তার বিশিষ্ট সর্ত্ত-ও বটে। এবং একারণেই আদিম যুগ ও পশুচারক সমাজ থেকে কৃষি-সমাজ থেকে শিল্পযুগে বিশেষায়ণ অনেক বেশি পরিলক্ষিত। আমরা যখন পরিকল্পনার ও সামাজিক প্রগতির কথা বলি তখন বিশেষায়ণের দাবী অগ্রাহ্য করা চলে না। পরিকল্পনার একটি বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বিকাশের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ—এবং এই সুষ্ঠু ব্যবহার তথা অপচয় নিবারণের জন্যই সম্পদের অনুপযুক্ত বা সমাজকল্যাণের দিক থেকে কম উপযুক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি সম্পদের উপযোগ ও অবদান সর্ব্বাধিক করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে যথাযথভাবে আবণ্টন

(allocation) করার চেষ্টা হয়ে থাকে। বিশেষায়ণ এই পরিকল্পিত আবণ্টনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গী বলেই সামাজিক পরিকল্পনার পক্ষে অপরিহার্য। ইস্পাত রেল লাইন তৈরীর কাজেও লাগান যায়, আবার চলচ্চিত্রভবন তৈরীর কাজেও লাগান যায়। কিন্তু যখন যথেষ্ট ইস্পাতের অভাবে রেল লাইন বসান যাচ্ছে না, তখন সেই ইস্পাত যাতে অপেক্ষাকৃত কম উপযোগী কাজে অপচিত না হয়, তা দেখার জন্যই আমরা পরিকল্পনা চাই। তেমনি কোন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করান সম্ভব হলেও, কোন সৎ পরিকল্পনাকারই সাধারণতঃ তা সমর্থন করবেন না। কারণ, যদিও জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে সেই শিল্পটি সিনেমা-শিল্পের চাইতে বেশী উপযোগী, তবুও একজন সুদক্ষ অভিনেতা তাঁর নিজস্ব কর্ম্মক্ষেত্র সমাজের জন্য যে পরিমাণে উপযোগ সৃষ্টি করতে পারেন, একজন অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে অন্যত্র তাঁর সামাজিক অবদান নিঃসন্দেহে তার থেকে কম হবে। এবং এজন্যই তাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষায়ণের সুযোগ দেওয়া, ও যাতে তিনি সেই কাজে তৃপ্ত মনে পূর্ণ-মনোযোগ দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে বস্তুসম্পদ ব্যবহারে আবণ্টনের যা ভূমিকা, মানবসম্পদের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষায়ণ তারই এক বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। কিন্তু অন্য বস্তুসম্পদ থেকে মানুষ তাঁর চেতনা ও মর্যদার দ্বারা পৃথক। এজন্যই বিশেষায়ণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক ক্ষেত্রনির্বাচনের বিশেষ স্বীকৃতি প্রয়োজন, যা অন্যান্য সম্পদ আবণ্টনের ক্ষেত্রে সম্ভব নয় বলেই পরিকল্পনা কমিশনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মানব-সম্পদ সম্বন্ধেও যে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনায় যথাযথ ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক; এবং পরিকল্পনার যে স্তরকে Subsidiary Budgeting বলা হয়, সেখানে অন্যান্য সম্পদের মত বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন ও প্রাপ্তি-সম্ভাব্যতা হিসেব করা হয়। যে পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে সমাজকাঠামোর রূপান্তর তথা প্রগতি সম্বন্ধে উৎসুক, তাকে অবশ্যই এই সময়ে নিছক দক্ষশ্রমিক, যন্ত্রবিদ ও শিল্পবিশেষজ্ঞ ইত্যাদির বাইরেও সমাজের প্রয়োজনের সমস্ত বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই দৃষ্টিপাত করতে হবে। যে যুগে আইন প্রণয়ন, প্রশাসন বা রাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ সমস্তই ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে, সে ক্ষেত্রে এসব কাজের জন্য নিশ্চিতভাবে সর্ব্বসময়ের বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। তাঁদের "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাষ্টার" হবার দরকার নেই, তবে রাষ্ট্রের ও সমাজের কল্যাণের জন্য নিজস্ব দায়িত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রকর্ম্ম বা রাষ্ট্রনীতি-নির্দ্ধারণই তাদের প্রধান মনোযোগের ক্ষেত্র হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে তাঁরা অংশতঃ বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক, আর অংশতঃ আইনপ্রণেতা, প্রশাসনাধিকারিক বা রাজনৈতিক নেতা হতে পারেন না—হ'লে তাদের উভয় কর্ম্মক্ষেত্রই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অবশ্য বলা যেতে পারে যে কেউ যদি তাঁর বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রকর্ম্মে সর্ব্বসময় নিয়োগ করেন, তবে তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে? এর উত্তরও আমার পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দিয়েছিলাম। আইনের সাহায্যে মানুষের কর্ম্মনির্ব্বাচন ও পেশা পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অশুভ বলে উল্লেখ করেও আমি বলেছিলাম যে অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে সমস্ত শক্তি মানুষের প্রবণতাগুলি প্রভাবিত করে থাকে, তাদের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ দ্বারা রাষ্ট্রকর্ম্ম ইত্যাদিতে অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের ক্রমবর্দ্ধমান আগমন একারণেই বন্ধ করা উচিত যে এতে অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের এমন ক্ষতি হতে পারে যা পূরণ করা ভারতবর্ষের মত পেছিয়ে পড়া দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রকর্ম্ম বা আইনপ্রণয়ন দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক হলেও, একথা ভুলে যাওয়া নিছক বুদ্ধিহীনতা যে রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজের আরও বহু দরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে আছে—সব যোগ্য লোকই যদি সে সব স্থান ছেড়ে রাষ্ট্রকর্ম্ম ইত্যাদিতে মনোযোগী হয়ে ওঠেন, তবে সমাজ বা রাষ্ট্র

কোনটাই বাড়তে পারে না। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে সর্বত্র সমুজ্জ্বল যে সমাজ, সেখানেই রাষ্ট্রও শক্তিশালী। রাষ্ট্রকর্ম বা বিধানসভার কাজে বহু যোগ্য এবং নমস্য ব্যক্তি আছেন; যাদের সেসব কাজে স্বাভাবিক প্রবণতা ও বিশেষ যোগ্যতা আছে, তারা সেখানে নিশ্চয়ই যাবেন— কিন্তু সমাজের আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংগঠন কেন সর্বক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরই রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রগুলিতে টেনে নিয়ে যাবার প্রবণতাকে শক্তিশালী করবে? টোটালিটারিয়েন চিন্তাধারায় সমাজের অন্যসব সংস্থা ও কর্মক্ষেত্রগুলিকে শুকিয়ে রাষ্ট্রকে মহীয়ান করার এই প্রবণতা হয়ত বোঝা যেতে পারে, কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে এর যৌক্তিকতা কোথায়?

সোমেন বাবু ভাবছেন যে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীরা বিধানসভা ও লোকসভায় গেলে বৃহত্তর সত্যের ও মানুষের বিবেকের বাণী প্রতিধ্বনিত করতে পারবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, রল্যাঁ বা আইনস্টাইন[১] যদি কোন বিধানসভার বা রাজনৈতিক দলের সদস্য কিম্বা রাষ্ট্রসচিব না হয়েও মানুষের বিবেকের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে থাকেন, তবে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের রাজনৈতিক বা বৃহত্তর সামাজিক জীবনকে সুস্থ রাখার জন্য বিধানসভা, সেক্রেটারিয়েট অথবা রাজনৈতিক দলে গিয়ে ভেড়া কেন অত্যাবশ্যক হবে?

সোমেন বাবু নিজেও স্বীকার করেছেন যে বিধানসভা ইত্যাদির বাইরেও বিরাটায়তন দেশ ও তার বিপুলায়তন সমস্যা আছে। কিন্তু সেই সব নানারকম সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গভীরভাবে চিন্তা করবার জন্য বিধানসভার বাইরেও কি কিছু সেরা লোকের থাকা দরকার নয়?

সোমেন বাবু অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে এতে বর্ণাশ্রমের প্রথার গন্ধ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তিনি যদি বর্ণাশ্রমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আদৌ চিন্তা করতে সচেষ্ট হতেন তবে আমার বক্তব্যের সঙ্গে সেই অচল প্রথাটির সাদৃশ্য আবিষ্কারের পণ্ডশ্রম করতে হত না। বর্ণাশ্রমের বৈশিষ্ট্য দুটি প্রথমতঃ, এতে পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করে জন্মদ্বারা পেশা নির্দেশ করা হয়; দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথায় পেশা পরিবর্তন কঠোর সামাজিক শাস্তিদ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি জন্মগতভাবে তো নয়ই এমন কি আইন অনুযায়ী পেশা নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করার-ও বিরোধিতা করেছি। পেশা পরিবর্তন নিষিদ্ধ করার বা কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাস্তি বিধানের কথাও আমি একবারও বলি নি।

আমি অবশ্য বুদ্ধিজীবীর ক্রমবর্দ্ধমান রাষ্ট্রমনস্কতাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করি এবং সেজন্যই তার পেছনের বাধ্যকারী শক্তিগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলাম। মূলতঃ এই এই হিসেবে তিনটি বাধ্যকারী শক্তির উল্লেখ করেছিলাম। এরা হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতার ক্রমবর্দ্ধমান কেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রকর্মের প্রতি বিশেষ ঝোঁকযুক্ত অবাঞ্ছিত পারিশ্রমিক কাঠামো, এবং সামাজিক সম্মানতালিকায় অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিকার বা রাষ্ট্রকর্মকে উচ্চতর স্থান। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিজীবিদের ওপর এই অদৃশ্য শক্তিগুলির অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বর্তমানে যে ভাবে পেশা পরিবর্তন ঘটছে, তার মূলে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা বা বিশেষ ক্ষমতার চেয়ে অন্যান্য বাধ্যকারী শক্তির বিকৃত প্রভাব বেশী কার্য্যকরী বলেই পরিকল্পিতভাবে সেই কুপ্রভাব সংশোধনে মনোযোগী হতে হবে। এর পরেও যদি উপযুক্তভাবে স্থিরীকৃত আবর্তনের সামাজিক আদর্শ ও প্রকৃত অবস্থার মধ্যে বৈষম্য থেকে যায়, তবে প্রয়ো-

১ প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে ইসরাইলের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণে অনুরোধ জানান সত্ত্বেও আইনষ্টাইন তা' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

জনীয় ক্ষেত্রগুলিতে উপযুক্ত মানুষের অভাব ঘোচাবার জন্য নতুন ধরণের সম্মান ও মূল্যবোধের সৃষ্টি এবং আবশ্যকমত বস্তুগত ও আর্থিক সুবিধে বাড়াতে হবে।[২]

আমার আশ্বিন সংখ্যায় প্রবন্ধটিতে অবশ্য আমি স্থানাভাবের কথা স্মরণ রেখে সমস্যাটিকেই উপস্থিত করেছিলাম—সমাধান সম্পর্কে সামান্যমাত্র ইঙ্গিতের বেশি যেতে পারি নি। প্রশ্ন তোলবার বা সমালোচনার ক্ষেত্র তাতেও বহু ছিল— এবং এখনও থাকতে পারে। তবে তা মূল্যবান হবে ও লেখকের বক্তব্যের উপযুক্ত অনুধাবনের ভিত্তিতে হবে এটুকু অন্ততঃ আশা করেছিলাম। কিন্তু সোমেন বাবু কেন বুদ্ধিজীবিরা রাষ্ট্রমনস্ক হচ্ছেন সে কথা ভাববার চেষ্টা তো করেন-ই নি, অত্যাধিক রাষ্ট্রমনস্কতার বিপদ বলতে মূলতঃ কোনটি আজ প্রধান সে সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ সত্ত্বেও, তাঁর স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

অবশ্য এর জন্য তাকে এক হিসেবে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। অতি-রাজনৈতিক জড়তার যে বিপদ আমাদের সমাজজীবনে কিছুকাল থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে আমি এর আগে বিশেষ কিছু ভাবি নি। সোমেন বাবুর "সমালোচনা" পড়তে পড়তে সে সম্বন্ধেও আমি নতুন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন বোধ করছি। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা রাজনৈতিক দলে কাজ করা যে নিন্দনীয় বা তুচ্ছ কাজ তা' আমি কোথাও লেখা দূরে থাক, কোনদিন মনেও করি নি। বিধানমণ্ডলের বাইরে যেমন রাজনৈতিক দলের দরকারী বহু কাজ রয়েছে, তেমনি নির্বাচনদ্বন্দ্ব বা বিধানমণ্ডলের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সমালোচনা ইত্যাদির উল্লেখ্য সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধেও আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। কিন্তু রাজনৈতিক সমালোচনা যে অনেক সময় হাস্যকর মূঢ়তা ও পরমত অসহিষ্ণুতা-তে পর্য্যবসিত হয়, বহুশ্রুত সে অভিযোগ দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মনে তেমন দাগ কাটতে পারে নি। রাজনৈতিক সচেতনতা ও পারস্পরিক সমালোচনার প্রয়োজনে আমার আস্থা আজও অটুট। কিন্তু অতি-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপদ সম্বন্ধে সোমেন বাবুই আমাকে প্রথম অবহিত করালেন। চিন্তার ক্ষেত্রে যে অপ্রমত্ততা এবং পরমত সহিষ্ণুতা আবশ্যক, চলতি রাজনীতির ময়দানে তা' দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সেজন্যই দেশের শ্রদ্ধেয় চিন্তাবিদদের একাংশকে সক্রিয় রাজনীতির বাইরে রাখা দরকার। সেটা রাজনীতির পক্ষেও ভাল। কারণ বদ্ধমুষ্ঠির আস্ফালনই যারা বিতর্কের একমাত্র ভাষা বলে জানেন, তাঁদের সংযত করার জন্য বিরাট ব্যক্তিত্বের অপ্রমত্ত কন্ঠেরই প্রয়োজন। অবশ্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রয়োজনমত চিন্তা করা বা কথা বলা মানেই যদি রাজনীতি হয় (যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ ও রল্যাঁ রাজনীতি করেছিলেন মনে করে সোমেন বাবু উল্লসিত হয়েছেন), তবে অবশ্য তাও 'রাজনীতি'-ই হবে। তবে সেরকম "রাজনীতি" করবার মত কিছু শ্রেষ্ঠ লোককে কিভাবে রাষ্ট্রকর্ম বা বিধানমণ্ডলের বাইরে রাখা যায়, বোধহয় তা-ই এদেশের অন্যতম সমস্যা।

সুব্রতেশ ঘোষ

২ কিন্তু ভ্রান্তধারণা এড়াবার জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম বিশেষজ্ঞ আকর্ষণ প্রয়োজন, এবং সেজন্য কি কি বিশেষ সুবিধে সৃষ্টি করা যেতে পারে তা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হবে। বর্তমানে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে যে সব বৈষম্য রয়েছে তা অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বলেই অবশ্য বর্জ্জনীয়।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

বর্তমানে বাংলা দেশে সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের বেশ একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এতে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এই কিছুকাল আগেও সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের পথ ছিল একেবারে আলাদা। তখন রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের দু-একটি উপন্যাস চিত্রায়িত হত বটে, কিন্তু চলচ্চিত্রের জন্যে কাহিনী লিখতেন প্রধানতঃ অসাহিত্যিকরা যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছবি পরিচালনাও করতেন। অর্থাৎ গল্প লেখা হত সেলুলয়েডের জন্যে—সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে নয়। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তৎকালে চলচ্চিত্রে চমৎকারিত্বই ছিল বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পর্দার বুকে প্রতিফলিত কায়াহীন মানুষেরা চলাফেরা করে, হাতমুখ নাড়ে, শুধু তাই নয়, কথাও বলে, এই বিস্ময় জয় করতে দর্শকদের অনেকদিন লেগেছে। উক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও, ইতিহাস বা পুরাণ অথবা বাইবেলের কাহিনী আশ্রিত হলিউডের জাঁকজমকপূর্ণ ছবি দেখে-দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, চলচ্চিত্রশিল্প আর যাদুবিদ্যা বুঝি সমার্থক। তাই ক্যামেরার কারসাজি আর নয়নাভিরাম দৃশ্য আমাদের মনকে সহজেই বিস্ময়াভিভূত করে। কিন্তু বাংলা ছবির বাজার সঙ্কুচিত। অথচ হলিউডের অনুকরণে ছবি তৈরি করতে গেলে খরচ প্রচুর, উপযুক্ত সরঞ্জামেরও অভাব। এই কারণেই বোধহয় এদেশী প্রযোজক ও পরিচালকরা গল্পের মনোহারিত্ব দিয়ে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। তার ফলে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের হরিহর আত্মা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং ষ্টুডিওর ফ্লোরে আজকাল নামী লেখকদের পায়ের ধুলো পড়ছে। বলা বাহুল্য সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই রয়েছে ষোল আনা ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি—যার জন্যে বেছে বেছে চটকদার গল্পগুলিই নির্বাচিত করা হয়। এমন কী ব্যবসার জন্যে প্রয়োজন হলে শিল্প ধর্মের হানি করেও গল্পকে পরিবর্তন করা হয়।

নামকরা উপন্যাসকে চিত্রায়িত করার পেছনে ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি যতই কার্যকর হক না কেন, এর ফল চলচ্চিত্রের পক্ষে শুভ হয়েছে সন্দেহ নেই। আগে চলচ্চিত্রে কাহিনীর দৈন্যদশা ছিল, বর্তমানে তা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র রচিত উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের আমরা রূপালী পর্দায় দেখতে পাচ্ছি, অন্যদিকে তেমনি একেবারে হালের লেখকদের গল্প নিয়েও ছবি তৈরি হচ্ছে। খ্যাতনামা কোন কোন আধুনিক লেখক পরিচালনার কাজেও যোগ দিয়েছেন।

আর্ট ফর্ম হিসেবে কিন্তু চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের কোন মিল নেই। চলচ্চিত্র ভিস্যুয়াল আর্ট চোখে দেখার জিনিস—এখানে পাত্রপাত্রীদের চেহারা থেকে সুরু করে কোন কিছুই দর্শকদের কল্পনা করে নিতে হয় না। অপরদিকে সাহিত্যের পাঠক চোখ দিয়ে পড়েন এবং মনে মনে কল্পনা করেন। তবে উভয় ক্ষেত্রেই স্রষ্টার পক্ষে প্রয়োজন হয় ভিস্যুয়ালাইজ করার ক্ষমতার। উপন্যাসকার যেমন সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে তাঁর মানসপটে সুস্পষ্টভাবে এঁকে নেন, তেমনি পরিচালকও ছবি তোলার বহু আগে সমস্ত দৃশ্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বইটা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেন। পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে ত কথাই নেই।

চলচ্চিত্র সাহিত্যের তুলনায় নিতান্তই অর্বাচীন। যন্ত্রযুগের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার এই চলচ্চিত্র। এর সমস্তটাই যান্ত্রিকতার সূত্রে বাঁধা। দৃশ্যপট, চিত্রগ্রহণ, অভিনয় প্রভৃতি সবকিছুই প্রথমে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় থাকে, তারপর ল্যাবরেটারিতে সেগুলিকে জুড়ে ধারাবাহিকতা আনা হয়। কিন্তু মূল পরিকল্পনাটা এলোমেলো নয়। ছবি তোলার সময় খাপছাড়া ভাবে তোলা হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠিক এর উল্টোটাই ঘটে। উপন্যাসকার যখন কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনা মনে মনে গড়ে তোলেন, তখন তার মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা থাকে না; সেটির রূপ দেওয়া হয় অবিচ্ছিন্নভাবে। তার মধ্যে যান্ত্রিকতার লেশমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাহিত্যকে বরং অনেকাংশে প্রেরণা সঞ্জাত বলা যায়। চলচ্চিত্রে প্রেরণার বালাই নেই।

সাহিত্যপাঠের জন্যে প্রয়োজন হয়, নিম্নতম একটা শিক্ষার। অবশ্য সাহিত্য যথার্থভাবে উপভোগ করতে গেলে উপযুক্ত শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান হতেই হয়, বিশেষ করে এযুগে। কিন্তু নিরক্ষর জনসাধারণও চলচ্চিত্রের রস গ্রহণ করতে পারে, কারণ এর ভাষা নিরক্ষর। এই জন্যেই চলচ্চিত্র বর্তমানে সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পকলা। চলচ্চিত্র একই সঙ্গে ব্যবসা ও শিল্পকলা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসাটা মুখ্য শিল্পসৃষ্টি গৌণ। জনসাধারণের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রধানতঃ ছবি তোলা হয়। এ-ছাড়া গত্যন্তর নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটা ছবি তোলা হয়। সেখানে ব্যবসার দিকে নজর না দিলে চলে না। যে-ছবি যত বেশি লোকের উপভোগ্য হবে তার ব্যবসায়িক সাফল্য তত বেশি। উঁচু দরের শিল্পসৃষ্টি হয়েও সর্বজনকে সন্তুষ্ট খুব কম ছবিই করতে পারে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবসাটা আসল নয়। বর্তমান যুগে সাহিত্যও পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে বটে এবং মুদ্রিত আকারে পাঠকের হাতে না পৌঁছলে সাহিত্য সৃষ্টি প্রায় অর্থহীন হয়ে যায়, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, লেখক পাঠকের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে লেখেন না। অবশ্য এখনকার কাঞ্চনবাদী লেখকদের কথা আলাদা, কারণ সাহিত্যসৃষ্টি এঁদের কাছে অর্থোপার্জনের উপায় মাত্র।

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় তফাৎ এই যে, সাহিত্য একক প্রচেষ্টার ফল, কিন্তু অনেকের কর্মোদ্যম একীভূত হলে তবেই একটা ছবি তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ চলচ্চিত্র যৌথশিল্প। আর এটাই চলচ্চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আসল কথা, সাহিত্যের মত চলচ্চিত্রও মূলত কোন আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও একের সঙ্গে অপরের বিশেষ কোন মিল নেই। বিজ্ঞানের এমন অভাবনীয় উন্নতি না হলে চলচ্চিত্রের জন্মই হত না। তাই চলচ্চিত্র অনেকাংশেই যান্ত্রিক কলাকৌশলের ওপর নির্ভরশীল। পরিচালক বহু দৃশ্যের সমন্বয়ে এক অখণ্ড রূপসত্তা গড়ে তোলেন। দৃশ্যগুলির পরিকল্পনা যদি শিল্পসম্মত ও ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের চিত্ররূপও ছবি হিসাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই কারণেই তারাশঙ্করের বিখ্যাত ছোটগল্প "ডাক হরকরা" অবলম্বনে গৃহীত ছবি আমাদের হতাশ করেছে। কোন উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে গিয়ে তাকে পুরোপুরি অনুসরণ করার দরকার পড়ে না। তাকে চলচ্চিত্রের উপযোগী করে নিতে হয়। সাহিত্যের গল্প কতখানি অবিকৃতভাবে ছবিতে পরিবেশিত হল, এই কষ্টিপাথরে চলচ্চিত্রশিল্পের বিচার সেইজন্যে কখনই করা চলে না। গঠনে ঢিলেঢালা হয়েও বক্তব্যের জোরে একটা উপন্যাস উতরে যেতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

হীরেন বসু

স মা লো চ না

অনুন্নত দেশে শিল্পোন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সমস্যা

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেই শিল্পোন্নয়নের সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে। যদিও সেই ভাবী সমাজের কি রূপ হবে এবং কি ভাবে সেই সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, সে সম্পর্কে অধিকাংশ ব্যক্তিরই কোন সুস্পষ্ট ধারনা নেই। অন্যান্য উন্নত দেশের শিল্পোন্নয়ন যে যুগে এবং যে পরিবেশে সুরু হয়েছিল, তাকে কোন ক্রমেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ইংলণ্ড, জাপান, রাশিয়া ও জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাস আমাদের সামনে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় এবং তথ্য উপস্থিত করলেও অনুকরণের নির্মিত্ত কোন পথ নির্দেশে অক্ষম। বিদেশের উপনিবেশ, স্বদেশের কৃষক শ্রেণীর উপর অত্যধিক করভার এবং শ্রমিক শ্রেণীকে তার যথার্থ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেই উক্ত দেশগুলি মূল ধন সংগ্রহ করেছিল। যদিও সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পূর্বে মূলধনে গঠনের প্রথম উৎসটির অবদান একেবারেই অনুপস্থিত। সদ্য স্বাধীন অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নই একমাত্র সমস্যা নয়। ভোটাধিকার প্রাপ্ত কৃষকশ্রেণী, খুব শক্তিশালী না হলেও, শক্তিশালী মজুর-আন্দোলন এই দেশগুলিতে মূলধন গঠনের সমস্যাকে জটিলতর করেছে। অথচ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এই দেশগুলিতে অনুপস্থিত থাকায়, যে কোন শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা হয় এক নায়কত্বের দিকে নিয়ে যাবে নতুবা অরাজকতার সৃষ্টি করবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে কি ভাবে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব যার ফলে একদিকে উন্নততর জীবনযাত্রার মান সাধারণ মানুষের করায়ত্ত হবে, অন্য দিকে সমাজের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক ধারাগুলিকে শক্তিশালী করে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করবে? অনুন্নত দেশে শিল্পোন্নয়নের এই দ্বিমুখীন সমস্যা সচরাচর আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় সুখের বিষয় চারটি প্রবন্ধ নিয়ে সদ্য প্রকাশিত পুস্তকে অধ্যাপক অম্লান দত্ত এই সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন এবং কি ভাবে সমাধান সম্ভব, সে পন্থাও নির্দেশ করেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেবল একটি গোষ্ঠীকে শিল্পোন্নয়নের সমস্ত ব্যয়ভার বহনে বাধ্য করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। এই পরিবর্তিত পৃথিবীতে ইংলণ্ড, জাপান বা রাশিয়ার মত জোর জুলুমের দ্বারা শিল্পোন্নয়ন নয়, সমাজের প্রতিটি অংশের সহযোগিতার ভিত্তিতেই শিল্পোন্নয়ন করতে হবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করবার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। যে পথে আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব, তা হল সমবায়ের পথ। গতানুগতিক সমবায় সমিতির মারফৎ একাজ সম্ভব নয়। অধ্যাপক দত্ত একটি সমাজদর্শনের কথা বলেছেন এবং এ যুগের একটি প্রধানতম সমস্যার সমাধানকল্পে সেই সমাজদর্শনের প্রয়োগ কি ভাবে সম্ভব, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সহযোগতার ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়নের জন্য সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এই ত্যাগ স্বীকার ব্যতিক্রম নয়। শিল্পোন্নয়নের প্রাক্কালে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দ্বৈত ভূমিকার কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য যেমন অবিরাম সংগ্রাম করবে, তেমনি শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে দায়িত্বশীল সহ-

যোগিতার ঐতিহ্যও সৃষ্টি করতে হবে, আবার শ্রমের মর্যাদাবোধ প্রভৃতি গুণ অপরিহার্য। এই নূতন অভ্যাসগুলি সহজে শ্রমিকদের করায়ত্ত হতে চায় না। পূর্বে বলপ্রয়োগের ফলে শ্রমিকেরা এই অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করতে বাধ্য হত। কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশে উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা শ্রমিকদের উক্ত অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে, এবং এই পদ্ধতির সাফল্য একমাত্র গণপ্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব। এই কারণে অধ্যাপক দত্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে আলোচনার ঐতিহ্য সৃষ্টির পক্ষপাতী। এই ধরণের আলোচনার মাধ্যমে বহু বিষয়ে যেমন মতৈক্য সৃষ্টি সম্ভব, তেমনি মতানৈক্য কয়েকটি প্রান্তীয় প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখাও প্রয়োজন। যদিও বেশী ভোটের আশায় সামান্য মতানৈক্যকে বিরাট এবং মতৈক্যকে চাপা দেওয়ার একটা প্রবণতা প্রায় সমস্ত অনুন্নত দেশেই দেখা যায়। অধ্যাপক দত্ত একটি বিশেষ মতবাদের উল্লেখ করেছেন, যে মতবাদ মতৈক্য সৃষ্টির যে কোন প্রচেষ্টার প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে থাকে। এই মতবাদে বিশ্বাসীদের মতে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সহযোগিতার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর অন্যান্যদেশে এই মতবাদ ফিকে হয়ে এলেও, আমাদের দেশে এই মতবাদের প্রভাব আজও কম নয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সহযোগিতা তো কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বহু ব্যাপারে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সহযোগিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এই ভাবেই সহযোগিতার ক্ষেত্রেকে ক্রমে প্রশস্ত করতে হবে এবং সমাজ প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে।। সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে এই শান্তিপূর্ণ পন্থা শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসীদের নিকট একেবারেই গ্রহণ যোগ্য নয়। তাঁদের মতে একমাত্র রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং একমাত্র তখনই সমাজ প্রগতির বিভিন্ন ধারার বাধাহীন প্রকাশ সম্ভব। লেখক দেখিয়েছেন যে, উক্ত মতবাদ কত ভ্রান্ত। রক্তাক্ত বিপ্লবের মারফৎ যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই শাসনব্যবস্থা যে পূর্বতন সমাজ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হবে না এমন কথা জোর করে বলা চলে না। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, উদারনৈতিক ভাবধারার প্রসার বিগত একশ বৎসরের মধ্যে ধনতন্ত্রকে আমূল ভাবে পরিবর্তিত করেছে। শ্রমিক শ্রেণী আর মালিকদের করুণার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রতিটি দেশ সামাজিক সাম্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় আয়ে সামাজিকরণের পরিমাণের বৃদ্ধিও থেমে নেই। শিল্প নিয়ন্ত্রণ, কর ব্যবস্থা, শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন আয়-বৈষম্যকে ক্রমেই সঙ্কুচিত করেছে। পক্ষান্তরে রক্তাক্ত বিপ্লবের মারফৎ যে সমস্ত দেশ সর্বপ্রকার শোষণ এবং অসাম্য দূরীকরণে অগ্রসর হয়েছিল, সেই সমস্ত দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা ক্রমেই স্বৈরাচারী শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে।

স্বাধীনতার অর্থই হল, "স্বাধীন চিন্তার স্বাধীনতা" এই স্বাধীনতার সর্বপ্রধান শত্রু হল আদর্শগত গোঁড়ামী। এই দিক থেকে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজম স্বাধীন চিন্তার সবচেয়ে বড় শত্রু। দুটি মতবাদ পরস্পর বিরোধী মনে হলেও উভয়ের মধ্যে মূলগত ঐক্য কম নয়। কম্যুনিজম সমস্ত কিছু দেখে শ্রেণীর আলোকে। শ্রেণীই একমাত্র সত্য। ন্যায়-অন্যায়, নীতিবোধ প্রভৃতি শ্রেণী স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। যা শ্রেণী-স্বার্থকে পরিপুষ্ট করবে, তাই একমাত্র সত্য। ব্যক্তি-ও শ্রেণী-নিরপেক্ষ সত্যে কম্যুনিষ্টদের অনাস্থা সুপরিচিত। আবার, ফাসিবাদের নিকট জাতিই একমাত্র সত্য। জাতির স্বার্থ বৃদ্ধির প্রয়োজনে মিথ্যা প্রচার তাই অপরাধের নয়। একথা সত্য যে, জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক সত্যও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এবং আপেক্ষিক সত্য যখন নিত্য পরিবর্তনশীল, তখন জাতির স্বার্থে মিথ্যাপ্রচার তো কোন দোষের নয়!

অধ্যাপক দত্ত "সোভিয়েত কম্যুনিজম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন" প্রবন্ধে সোভিয়েত রাশিয়ায় একদলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তার ভ্রান্ততা ভাল দেখিয়ে দিয়েছেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় গণতন্ত্রের সমাধি কি ভাবে সম্ভব হল, কি কারণে সে দেশে আমলাতন্ত্র সর্বেসর্বা হতে পারল, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে লেনিনবাদী মতবাদ এবং সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। লেনিনই বিরোধীদল নিশ্চিহ্ন করে সোভিয়েত রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রের সূচনা করেন। এই প্রসঙ্গে রুশ বিপ্লবের অল্পদিন পরে রোজা লুক্সেমবুর্গের আশঙ্কা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয় কম্যুনিষ্টদল সম্প্রতি গণতন্ত্রে আস্থা প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের গণতন্ত্রের প্রতি এই মৌখিক সমর্থন কতটা কলা কৌশল জানিত, কতটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা প্রসূত, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অধ্যাপক দত্তের মতে, গণতন্ত্র সম্বন্ধে কম্যুনিষ্টদের প্রস্তাব বিশ্বাসযোগ্য কিনা, তা নির্ভর করছে দুটি প্রশ্নের স্বার্থবিহীন উত্তরের উপর। প্রথমতঃ কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে একদলীয় শাসনের সুস্পষ্ট উচ্চারণ করতে কম্যুনিষ্টরা রাজী আছেন কিনা, এবং দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে পৃথিবীতে মার্কস লেনিনের মৌল শিক্ষা বহুল পরিমাণে অচল হয়ে যাওয়ার পরেও কম্যুনিষ্ট দল লেনিনবাদ ত্যাগ করতে রাজী আছেন কিনা, তার উপর।

পৃথিবীতে কোন সমাজ ব্যবস্থাই যখন শ্বাশ্বত নয়, সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাও চিরস্থায়ী হবে না। একদলীয় শাসনের অবসানে সোভিয়েত রাশিয়ায় কি ভাবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সে সম্পর্কে অধ্যাপক দত্ত সম্ভাব্য পথ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। বর্তমান পুস্তকের কয়েকটি ত্রুটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। অধ্যাপক দত্ত রুশদেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে লেনিনবাদকে দায়ী করেছেন, যা বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন ছিল। এবং লেনিনবাদী মতবাদ সবদেশে যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, হাঙ্গেরী এবং পোলাণ্ড তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। লেনিনবাদী মতবাদ রুশদেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার যে উর্বর ক্ষেত্র পেয়েছিল, অধ্যাপক দত্তের তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ছিল। আবার রুশদেশে একনায়কত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে লেনিন দায়ী হলেও, মার্কসীয় শ্রেণী সত্য কি একনায়কত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেনি, যা তিনি "গণতন্ত্রের অধ্যাত্মিক ভিত্তি" প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে জিলাসের 'নিউক্লাস' পুস্তকের Tyerany over the Mind অধ্যায়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। দুই একটি খুঁটি নাটি ত্রুটি সত্ত্বেও 'গণতন্ত্র প্রসঙ্গে' নিঃসন্দেহে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।

নিরঞ্জন হালদার

একালের চোখে ॥ অচিন্ত্যেশ ঘোষ ঃ মিত্রালয় ঃ দাম ৩ টাকা ঃ

যে কালে বাস করি সে কালের স্বরূপ কি তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে এবং অন্যান্য দেশে তা নিয়ে মোটা মোটা বই ছাপা হয়। আমাদের দেশে সে রেওয়াজ এখনও সুরু হয়নি—কারণ একালের কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সে কথা সাহস করে বলবার লোক বেশী নেই। কোন বস্তুকে ভাল বলতে সাহস হয় না কারণ হয়তো দেখা যাবে দুদিন পরে সেই বস্তুটার শূন্যতা ধরা পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে আমারও। আর খারাপ বলা আরও শক্ত কারণ সে বস্তুটা হয়তো ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অতএব মৌনতাই শ্রেয়। তার চেয়ে দুটো খুচরো গল্প,

সুর মেলানো কবিতা লিখলে বাজারে নামও হবে, দুপয়সা আসতেও পারে। অতএব একালের সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে চলার নীতিই মধ্যপথাবলম্বীদের নীতি।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ সাহস করে 'একালের কথা' লিখেছেন। অনেক কথা বলেছেন যা সাধারণের ভাল লাগবে না। আজকালকার অনেক রুচিবিকৃতির ঘোমটা খুলে তার পিছনকার কুৎসিত মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করেছেন। তার জন্য পরিশ্রম করেছেন, এবং তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করার জন্যে সমাজতত্ত্বের নানা প্রামাণ্যগ্রন্থের উধৃতি দিয়েছেন। দেবদেবী সংক্রান্ত আলোচনাগুলিকে 'অলৌকিক' নাম দিয়েছেন এবং সেখানেও মনস্তত্ত্বর অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। পারতপক্ষে তাঁর এই প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় একথা একশোবার বলবো। স্রোতে ভাসা জীবনের ভাটায় আজ জীবনের আসল স্বাস্থ্যের রং মুছে যখন মেকী রং বেরিয়ে পড়ছে তখন তার বিরুদ্ধে একটা লড়াই সুরু করে লেখক ভাল করেছেন এবং তাঁর বই চিন্তাশীল পাঠকেরা পড়ে দেখবেন এ অনুরোধ করবো।

তবে একটা কথা, অচিন্ত্যেশবাবু কোটেশনে বই কণ্টকিত করে ভাল করেন নি। সমাজতত্ত্বের যারা গবেষক তারাই কেবল এ বই পড়বেন এই কি তিনি আশা করেন—না তাঁর বই সাধারণে পড়ুক এটাও চান। তা যদি চান তাহলে এত তথ্যসমৃদ্ধির প্রয়োজন কি ছিল। অনেক কথা যেখানে তিনি এমনিই সহজ করে বলতে পারেন এবং পেরেছেন, সেখানেও অকারণে সুদীর্ঘ উধৃতি দেওয়ার কোন অর্থ খুঁজে পাইনে। উধৃতি কম হলে হয়তো একদল পাঠক তাঁর পাণ্ডিত্যে সন্দেহ প্রকাশ করবে—কিন্তু সে ভয় লেখকের পাওয়া উচিত নয়। কারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ তো তাঁর লক্ষ্য নয় তাঁর লক্ষ্য আধুনিক যুগের চিত্তবিকারের কারণ বিশ্লেষণ ও তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা। সেটার জন্য কিছুটা দরকার তথ্য আর তার চেয়ে বেশী দরকার আত্মোপলব্ধি। আত্মোপলব্ধি লেখকের অবশ্যই কিছু আছে সেটা তথ্যভারে প্রাথমিক হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন রবীন্দ্রজয়ন্তীর আলোচনায় আধুনিক ব্যক্তি সর্বস্বতার প্রসঙ্গে কার্ল ম্যানহাইমের ও এরিকফ্রোমের উদ্ধৃতি ও ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার আলোচনা কি অপরিহার্য ছিল।

আধুনিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখে তা নিয়ে হাসিঠাট্টার খোরাক জোগানোর ব্যবস্থা আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এবং কিছু কিছু সাপ্তাহিকে আছে। আধুনিক লেখকেরা যদি আর একটু চিন্তাসহকারে শুধু ব্যঙ্গবিদ্রূপ না করে এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাতে পাঠককে সমাজ সচেতন করে তোলার কাজ হবে এবং সাহিত্যের আসরও সমৃদ্ধ হবে। সে দিক থেকে 'একালের চোখে' কৃতিত্বের দাবী রাখে।

সোমেন বসু

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী ॥ অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক ॥ শান্তি লাইব্রেরী ; ॥ ২৲।

রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে বিভিন্ন সমালোচক এপর্যন্ত একাধিকবার আলোচনা করেছেন। বাঙলা সাহিত্য সমালোচনার আসরে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা আজ একটি বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেছে এবং বাঙলা সমালোচনা সাহিত্য কেবলমাত্র রবীন্দ্র সাহিত্যালোচনার দ্বারাই সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় সমালোচনার ক্ষেত্রে নবাগত নন; কিন্তু এপর্যন্ত আলোচিত রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে

সমালোচনাগুলি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম এবং এই হিসেবে সেগুলি নব্যাগতও বটে। কবিগুরুর এক একটি কাব্যগ্রন্থের খুঁটিনাটি আলোচনায় এক একটি অখণ্ড গ্রন্থরচনার প্রয়াস এই প্রথম না হলেও ক্রমান্বয়ে এজাতীয় প্রচেষ্টার দুঃসাহসিকতা অমিয়রতনেই প্রথম সম্ভব হয়েছে।

সোনার তরী কাব্যালোচনায় পাঁচটি অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে। "অহং" থেকে "আত্মায়", "ছোট আমি" থেকে "বড় আমিতে", "সেলফ" থেকে "সোলে" কচি-মনের যে ক্রমোত্তরণ প্রথম অধ্যায় তারই সহৃদয় আলোচনা। শুধু সোনার তরীই নয়। সমগ্র রবীন্দ্র কাব্যেই অহং থেকে আত্মায়, অল্প থেকে ভূমায় কবিচেতনায় যে অভিযাত্রা, একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে তারই শ্রুতিমধুর আলোচনা করেছেন অমিয়রতন। এই অধ্যায়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, "সোনার তরী"র 'সোনা' ও 'তরী' শব্দদ্বয়ের মৌলিক ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রকাব্যে অহং ও আত্মার যে ব্যঞ্জনা, সেটুকুর যথার্থ উপলব্ধি না হলেও সেসম্পর্কে বিশেষ সচেতনা না থাকলে রবীন্দ্র কাব্যরস আস্বাদন ব্যাহত হয়; সমালোচক সর্বাগ্রেই তাই কবির রসভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠিটি রসবেত্তার হাতে তুলে দেওয়ার আয়োজন করেছেন। অমিয়রতনের আলোচনাগ্রন্থগুলির এইটিই বোধহয় প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম-প্রকৃতি এবং জীবন মৃত্যুর বিশেষার্থকে সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। মৃত্যু যে "রবীন্দ্রশাস্ত্রে নেতিবাচক কোন তত্ত্ব নয় জীবনের প্রয়োজনেই তার মান ও মর্যাদা" চতুর্থ-অধ্যায়ে প্রচুর উদাহরণের মাধ্যমে তারই দীর্ঘ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রকাব্য পাঠে নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে আসবে শেষ অধ্যায়টি। সেখানে সোনার তরীর শিল্পকৃতি ও ছন্দসৌন্দর্যের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনাও রাখা হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থ সমালোচনায় অন্যতম উল্লেখনীয় বস্তু হল, এর ঋজু মধুক্ষরা ভাষাসম্পদ। সমালোচনা সাহিত্যে যাঁরা সুকঠিন শব্দ সম্ভার সাজিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়কে অযথা দুর্বোধ্য করে তোলেন ও যুক্তি দর্শান এই বলে যে বাক্‌ভঙ্গির বলিষ্ঠতা এবং বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশ অন্যথায় অসম্ভব, তাঁদের কাছে গ্রন্থখানি নিদর্শন স্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। ভাষা মাধুর্য যে বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার অন্যতম সহায়, সোনার তরীর আলোচনায় তা প্রমাণিত। অবশ্য অমিয়রতনের বাক্‌ভঙ্গির মধ্যে একটি মুদ্রাদোষ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ আর তা হল, 'যদি' 'তবে' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের বারম্বার ব্যবহার। মাত্রাধিক্য হেতু পুনরাবৃত্তি এক ঘেয়ে হতে বাধ্য। তবু একথা অনস্বীকার্য যে যে-বাগ্‌চাতুর্য "সোনার তরী" আলোচনায় সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, তার মধ্যেই লেখকের একটি বিশিষ্ট স্টাইল বা রীতিকে আমরা একান্তভাবে অমিয়রতনের রীতি বলেই চিনে নিতে পারি একদৃষ্টিতে। ভাষা-মাধুর্যের গুণে আলোচনা শুধু পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষরই হয়নি; একটি রম্যরচনাতুল্য মাধুর্যে পাঠককে আশ্বস্ত মুগ্ধ করবার প্রতিশ্রুতিও রেখেছে।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা সুন্দর ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। ছাপা, বাঁধাই প্রশংসনীয়।
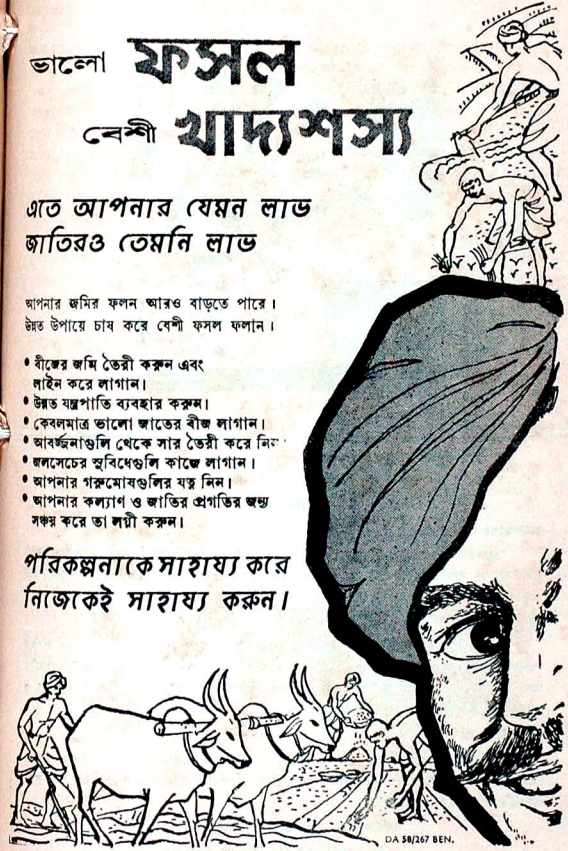
বীরেন্দ্র মিত্র